বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

চতুর্থ শ্রেণি

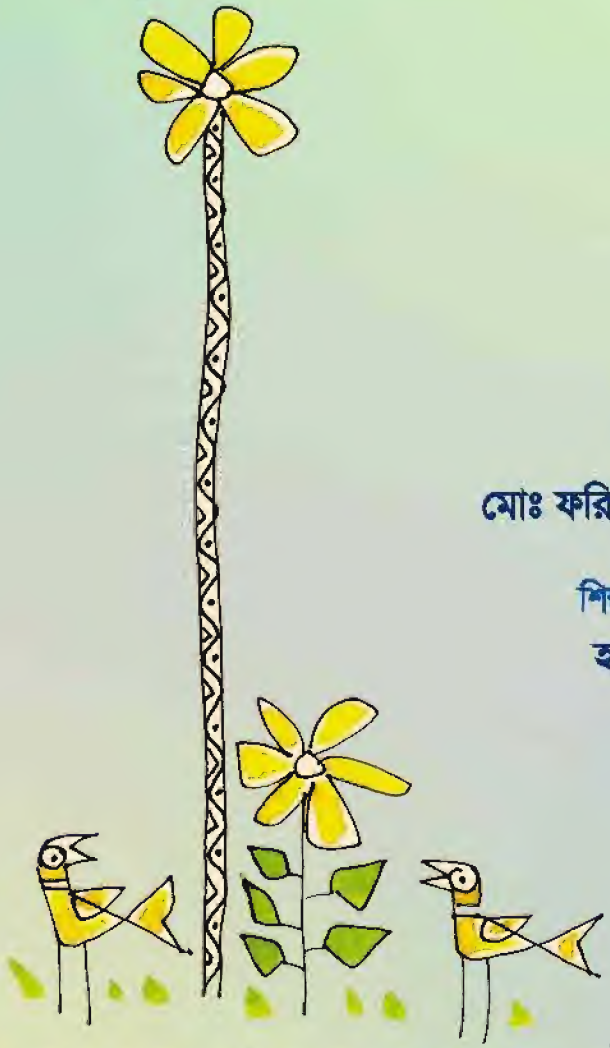

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মাহবুবা নাসরীন

ড. আব্দুল মালেক

ড. ঈশানী চক্রবর্তী

ড. সেলিনা আক্তার

চিত্রাঙ্কন

মোঃ ফরিদ হোসেন

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

সমন্বয়ক
এস. এম. নূর-এ-এলাহী

গ্রাফিক্স
জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেতু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময় । তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই । শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ । শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মৌলিক চাহিদা, শিশুদের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য, সমাজে সকল মানুষের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ, সুনাগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জন, অন্যের সংস্কৃতি ও পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ, সামাজিক পরিবেশ ও দুর্যোগ, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া হলেও কোনো শিক্ষাক্রমে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা নির্ভর করে অন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর। বিশেষত শিক্ষকদের সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সাথে শিশুদের শেখানোর বিষয়টি জড়িত। তা সত্ত্বেও যুগের চাহিদা ও বাস্তবতার সাথে নতুন কিছু বিষয়ে যেমন– বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও দুর্যোগকে শিশু যাতে মোকাবেলা করতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। সমাজের সকল নারী-পুরুষ, পেশাজীবী, ধনী-দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করা ও সকলের সাথে সম্প্রীতির মানসিকতা তৈরি করার জন্য কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে।

শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি লক্ষ রেখে যুগোপযোগী বিষয়ে তাকে প্রয়োজনীয় ধারণা দেওয়া হয়েছে যাতে এ বিষয়ে তার সচেতনতা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়বস্তু যাতে সহজবোধ্য হয় এবং শিশু সেগুলো আনন্দের সাথে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, মুখস্ত করতে না হয়, সেসব দিক লক্ষ রেখে পরিকল্পিত কাজ ও রঙিন চিত্র দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, জাতির পিতার জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও তথ্যসমূহ সংবিধান সম্মতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিষয়ে শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও সংবিধান অনুসৃত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	আমাদের পরিবেশ ও সমাজ	১
দ্বিতীয়	সমাজে সহাবস্থান ও সহযোগিতা	৬
তৃতীয়	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	১১
চতুর্থ	নাগরিকের অধিকার	২০
পঞ্চম	সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় সম্পদ	২৭
ষষ্ঠ	বিভিন্ন পেশার মর্যাদা	৩৭
সপ্তম	পরমতসহিষ্ণুতা	৪৩
অষ্টম	নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি	৪৮
নবম	এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড	৫৩
দশম	দুর্যোগ ও দুর্যোগ মোকাবেলা	৫৯
একাদশ	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	৬৮
দ্বাদশ	এশিয়া মহাদেশ	৭৩
ত্রয়োদশ	আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	৭৮
চর্তুদশ	আমাদের ইতিহাস	৮৫
পঞ্চদশ	আমাদের সংস্কৃতি	৯২
ষোড়শ	আমাদের বাংলাদেশ	১০০

প্রথম অধ্যায়

আমাদের পরিবেশ ও সমাজ

আগের শ্রেণিতে আমরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কথা জেনেছি। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কতগুলো উপাদানের সাথে পরিচিত হয়েছি। মাটি, পানি, বাতাস, তাপ, আলো, গাছপালা, সাগর, নদী, বিল, পশু, পাখি ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। আবার ঘর-বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, রাস্তা, হাট-বাজার, যানবাহন ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশের উপাদান। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদান পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো নানাভাবে মানুষের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোনো অঞ্চলে ঠান্ডা বেশি, কোনো অঞ্চলে গরম বেশি। কোনো কোনো অঞ্চল বরফে ঢাকা, কোনো কোনো

বরফ অঞ্চল

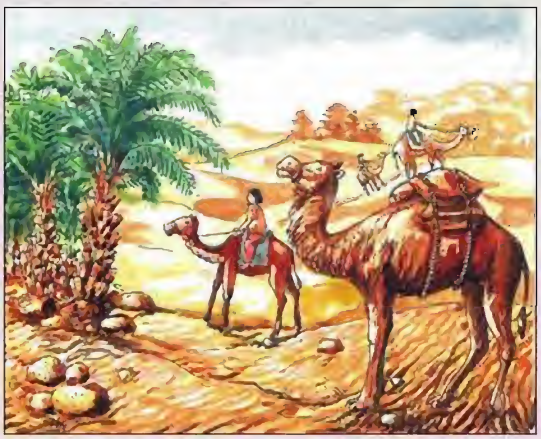

মরুভূমি অঞ্চল

অঞ্চল মরুভূমি। এসব অঞ্চলের মানুষের সামাজিক জীবনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানুষের ঘর-বাড়ি, পোশাক, খাবার, পেশা, উৎসব, আচার-রীতির মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের দেশ আয়তনে ছোট। কিন্তু বিভিন্ন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য রয়েছে। উত্তর এলাকার ভূমি কিছুটা উঁচু। নদনদী কম। গ্রীষ্মকালে অনেক গরম পড়ে। শীতকালে বেশ ঠান্ডা পড়ে। দক্ষিণ এলাকার ভূমি বেশ নিচু। অনেক নদনদী, খালবিল রয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তর এলাকার পরিবেশ

বাংলাদেশের দক্ষিণ এলাকার পরিবেশ

উত্তর এলাকার মানুষের ঘরবাড়ি, কাজকর্ম, খাবার, সামাজিক অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ইত্যাদি দক্ষিণ এলাকার চাইতে কিছুটা আলাদা। একইভাবে পূর্ব এলাকার সাথে পশ্চিম এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

কোনো এলাকায় গাছপালা বেশি থাকলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে ফসল ভালো হয়। আমরা প্রয়োজনীয় খাবার পাই। বেশি বৃষ্টি হলে নদী, খালবিল পানিতে ভরে যায়। আমরা প্রচুর মাছ পাই। ফসলে সেচ দেওয়ার জন্য পানি পাই। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের গাছ থেকে

বৃষ্টিমুখর পরিবেশ

আমরা কাঠ, ফল ও ফুল পাই। আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র বানাতে কাঠ লাগে। আমরা ফল খাই। আনন্দময় কাজে ও অনুষ্ঠানে আমরা ফুল ব্যবহার করি।

গাছপালা কমে গেলে বৃষ্টির অভাবে জমিতে ফসল কম হয়। নদী, খাল, বিলে পানির অভাবে মাছ কমে যায়। মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। মাটির ক্ষয় হয়। এতে ফসলের ক্ষতি হয়। নদী, খাল, বিল দিনে দিনে মাটিতে ভরাট হয়ে যায়। ফলে সমাজ জীবনে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

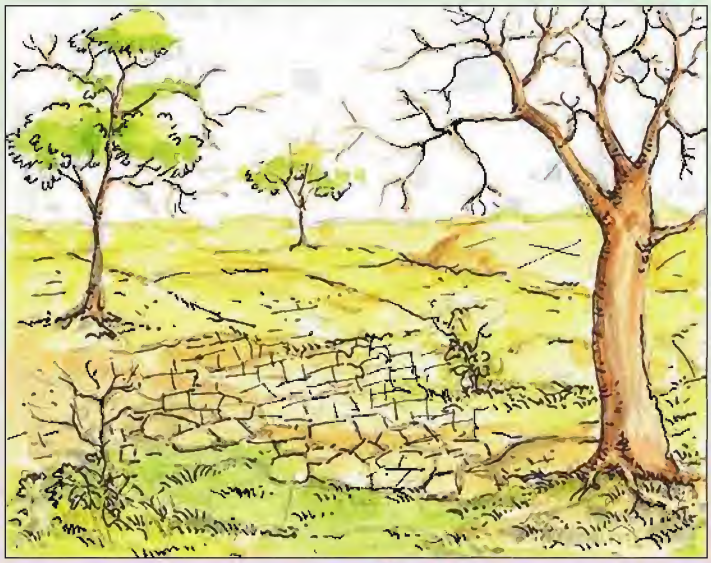

শুষ্ক পরিবেশ

পশুপাখি আমাদের নানা প্রয়োজন মেটায়। পশুপাখি থেকে আমরা মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি পাই। গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি পশুকে আমরা কৃষিকাজ, যাতায়াত, মালামাল পরিবহনসহ নানা কাজে ব্যবহার করি। বিভিন্ন প্রাণী নানাভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাতে সমাজ জীবনের অনেক উপকার হয়।

বাতাসে অক্সিজেন রয়েছে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। বাতাস দূষিত হলে আমাদের নানা রকম রোগ-ব্যাধি হয়। সমাজে মানুষ বেশি হলে অনেক ঘরবাড়ি প্রয়োজন হয়। বেশি রাস্তা-ঘাট, যানবাহন ইত্যাদি লাগে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে। ফলে মাটি, পানি, বায়ু নানাভাবে দূষিত হয়। গাছপালা ও পশুপাখির ক্ষতি হয়।

আমাদের সমাজ জীবন নানাভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তাই প্রকৃতির ক্ষতি হয় এমন কাজ আমরা করব না। অকারণে গাছপালা কাটব না। প্রয়োজনে কাটলে বেশি করে গাছ লাগাব। পশুপাখি ও অন্যান্য প্রাণী মারব না। খাল, বিল, নদীনালা ভরাট করব না। এভাবে আমরা পরিবেশ উন্নত রাখতে ভূমিকা পালন করব। আমরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে যত্নবান হব।

আবার পড়ি

১. প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদান পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
২. প্রকৃতির উপাদান মানুষের সমাজ জীবনের উপর প্রভাব ফেলে।
৩. ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সমাজ জীবন ভিন্ন ভিন্ন।
৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফলে এসব এলাকার সামাজিক পরিবেশের মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।
৫. প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি হলে সমাজের ক্ষতি হয়। তাই আমরা প্রকৃতির ক্ষতি করব না।

পরিকল্পিত কাজ

১. সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সম্বলিত চিত্র সংগ্রহ ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ কোনটি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান ?
ক. পানি খ. ঘরবাড়ি
গ. খেলার মাঠ ঘ. রাস্তা

১.২ কোনটি সামাজিক পরিবেশের উপাদান ?
ক. পশু খ. পাখি
গ. বিদ্যালয় ঘ. বাতাস

১.৩ আনন্দময় কাজে আমরা কী ব্যবহার করি ?
ক. যানবাহন খ. পাখি
গ. পশু ঘ. ফুল

১.৪ আমাদের সমাজ জীবন নানাভাবে কিসের উপর নির্ভরশীল ?
ক. পশু খ. পাখি
গ. নদী ঘ. প্রকৃতি

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদান পরস্পরের সাথে ———————— ।

খ. গাছপালা কমে গেলে ———————— অভাবে ফসল কম হয়।

গ. বিভিন্ন ———————— নানাভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

ঘ. প্রকৃতির ক্ষতি হয় এমন ———————— আমরা করব না।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. গাছপালা কমে গেলে	রোগ-ব্যাধি হয়
খ. সমাজে মানুষ বেশি হলে	গাছপালা কাটব না
গ. বাতাস দূষিত হলে	সমাজ জীবনে পার্থক্য সৃষ্টি করে
ঘ. প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য	মাটির ক্ষয় হয়
	অনেক ঘরবাড়ি লাগে

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. তোমার দেখা প্রাকৃতিক পরিবেশের পাঁচটি উপাদানের নাম লেখ।

খ. তোমাদের বাড়ির বা বাসার আশেপাশের সামাজিক পরিবেশের পাঁচটি উপাদানের নাম লেখ।

গ. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সমাজ জীবনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় কেন ?

ঘ. বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ কর।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. গাছপালা বেশি থাকলে আমরা কী কী সুফল পাই ?

খ. পরিবেশ উন্নত রাখতে আমরা কীভাবে ভূমিকা পালন করব ?

গ. পশুপাখি আমাদের কী কী প্রয়োজন মেটায় ?

ঘ. প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে আমাদের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজে সহাবস্থান ও সহযোগিতা

আমরা জানি যে, একটি সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ একসাথে মিলেমিশে বাস করে। এদের মধ্যে কেউ নারী, কেউ পুরুষ, কেউ ছেলেশিশু, কেউ মেয়েশিশু, কেউ দরিদ্র, কেউ ধনী হতে পারে। আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ধর্মের বা বিভিন্ন জাতিসত্তারও হতে পারে। ছবিতে সবাইকে দেখে নিই।

বিভিন্ন দিক থেকে আলাদা হলেও আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি বলেই সমাজটা এত সুন্দর।

আমাদের পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানিসহ অন্যান্য আত্মীয় পরিজন রয়েছে। এদের কেউ নারী, কেউ পুরুষ। আর নারী পুরুষ সবাই মিলে পরিবারের মঙ্গলের জন্য সবসময় চেষ্টা করি। একে অন্যকে সহায়তা করি। একসাথে নানা ধরনের কাজ করি। তেমনি নারী পুরুষ সবাই সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। দেশের উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সমান অবদান

রয়েছে। অথচ আমাদের সমাজে নারী পুরুষকে সবসময় সমান চোখে দেখা হয় না। যেমন– শিশুকাল থেকে অনেক পরিবারে মেয়ের তুলনায় ছেলেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। মনে করা হয় মেয়েরা পরিবারের কোনো উপকারে আসবে না। মেয়েরা শুধু ঘরের কাজ করবে আর ছেলেরা উপার্জন করে সংসার চালাবে। এই ধারণা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। এখন নারী-পুরুষ সবাই ঘরে বাইরে কাজ করছে। তাই সমাজে মেয়েদের ও ছেলেদের কাজ খুবই দরকারি। যেমন- আমরা ভাই-বোন মিলে ঘরের কাজ করি। আবার একই সাথে খেলাধুলা করি, পড়ালেখা করি। এভাবে শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়ে একসাথে কাজ করার অভ্যাস করতে পারলে নারী বা পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকবে না। আবার সমাজে নারীর মর্যাদাও বাড়বে।

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ পাশাপাশি কাজ করছে

নারী-পুরুষের ভেদাভেদ ছাড়াও সমাজে আরও অনেক কারণে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। কোনো শিশু হয়তো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। কোনো শিশুর মাতৃভাষা হয়তো বাংলা নয়। যেমন- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুর ভাষা। সবাই হয়তো এক ধর্মের নয়, আবার সবার মা-বাবার পেশাও এক নয়। যেমন– কারো মা-বাবা শ্রমজীবী, কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউ চাকরি, ব্যবসায় বা অন্যান্য কাজ করেন। এক কথায় বলতে গেলে একটা স্কুলে নানা ধরনের পরিবার থেকে শিশুরা পড়তে আসে। আবার সমাজে এমন শিশু আছে যারা নানা কারণে স্কুলে আসতে পারে না। আবার কোনো শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি

হলেও কিছুদিন পর আর আসে না। কেউ বাড়িতে বা মাঠে কাজ করার জন্য আসতে পারে না। কেউবা শিশু বয়সেই মা-বাবা বা বড়দের সাথে আয়মূলক কাজ করছে। স্বাভাবিক, সমস্যাগ্রস্ত, সমস্যাবিহীন, অসুবিধাগ্রস্ত শিশু এবং ছেলেমেয়ে সবাই একসাথে পড়ালেখা করছে। সমাজেও মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। আর এই বিভিন্নতাকে সমস্যা মনে না করে একে অন্যের প্রয়োজনে সহায়তা করা দরকার। সব ধরনের মানুষকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সমাজ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

এর আগে আমরা জেনেছি যে, সমাজে বা বিদ্যালয়ে সব জায়গাতেই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ বা শিশু থাকতে পারে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু কারা তা জেনে নিই- যেসব শিশু বিশেষভাবে অসুবিধাগ্রস্ত যেমন- কারো চোখে সমস্যার কারণে দুর থেকে বোর্ডের লেখা

একটি শিশু বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে সহায়তা করছে

পড়তে পারে না অথবা কারো হয়তো কানে শুনতে কিছুটা সমস্যা হয়, কেউবা শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত। কেউ হয়তো সহজে কোনো পড়া বুঝতে পারে না। যেমন– অটিস্টিক শিশুরা নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয় না। ভাষার ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারে না। নতুন কিছু পেলে তা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। এরা বিশেষ ধরনের আচরণ বারবার করতে থাকে। এসব শিশুরা শব্দ, আলো এবং স্পর্শের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এরা আমাদের সাথেই পড়তে পারে। শুধু তাদের ভিন্নতা মেনে নিয়ে একটু বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। আবার কোথাও ক্ষুদ্রজাতিসত্তার শিক্ষার্থী আছে যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, ফলে বাংলা ভাষা বুঝতে তাদের সমস্যা হয়। কিন্তু এরা সবাই আমাদের বন্ধু। আর বন্ধুর প্রয়োজনে বন্ধুরাই তো এগিয়ে আসবে। যে চোখে কম দেখে বা কানে

কম শোনে তাকে আমরা সামনে বসতে দেব। যাদের হাঁটতে সমস্যা হয় তাদের আমরা সহায়তা করব। যাদের পড়তে সমস্যা হয় তাদের আমরা সহায়তা করব যাতে তারা তাদের কাজগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে। আবার ভাষা বুঝতে সমস্যা হলে তাকে ক্লাস শেষ হলে পড়াটি বুঝিয়ে দেব। এভাবেই আমরা সবাই সবার পাশে দাঁড়াব। কাউকে কোনো খারাপ কথা বলব না যাতে সে মনে কষ্ট পায়। তাহলে সে পিছিয়ে পড়বে, স্কুলে ঠিকমতো আসতে চাইবে না। তখন সমাজেও সে কোনো অবদান রাখতে পারবে না।

আবার পড়ি

১. সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ একসাথে মিলেমিশে বাস করে বলে সমাজটা এত সুন্দর।
২. দেশের উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে।
৩. সমাজের সব জায়গাতেই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ বা শিশু থাকতে পারে।
৪. প্রয়োজনে আমরা সবাই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ বা শিশুসহ সবার পাশে দাঁড়াব।

পরিকল্পিত কাজ

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু কারা, তার তালিকা তৈরি করা।
২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের বাস্তবে কে কীভাবে সহায়তা করতে পারে তা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করা।
৩. সমাজে নারী-পুরুষের সহাবস্থান ও নারী-পুরুষের সমান অবদান সম্পর্কে বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ করা।
৪. গল্প বা অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ কীভাবে বাস করে ?

ক. বিচ্ছিন্নভাবে　　খ. একাকি
গ. মিলেমিশে　　ঘ. ভাগ হয়ে

১.২ সমাজে ও বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক মানুষ ছাড়া আর কারা বাস করে ?

ক. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ খ. চাকরিজীবী

গ. নারী ঘ. পুরুষ

১.৩ দেশের উন্নয়নে নারী ও পুরুষের কেমন অবদান রয়েছে ?

ক. পুরুষদের বেশি খ. নারীদের বেশি

গ. নারী পুরুষের সমান ঘ. কোনো অবদান নেই

১.৪ আমাদের সবার মা-বাবার পেশা কী রকম ?

ক. কৃষিকাজ করেন খ. ভিন্ন ভিন্ন কাজ করেন

গ. চাকরি করেন ঘ. ব্যবসায় করেন

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. সমাজের নারী পুরুষ সবাই সমাজের ———————— জন্য কাজ করে।

খ. সমাজে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ———————— রয়েছে।

গ. বন্ধুর প্রয়োজনে বন্ধু ———————— আসবে।

ঘ. আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি বলেই সমাজটা ————————।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. যে চোখে কম দেখে বা কানে কম শোনে	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ বা শিশু থাকতে পারে
খ. সমাজে বা বিদ্যালয়ে সব জায়গায়ই	সমান গুরুত্বপূর্ণ
গ. কাউকে কোনো খারাপ কথা বললে সে	তাকে আমরা সামনে বসতে দেব
ঘ. সমাজে মেয়েদের ও ছেলেদের কাজ	মনে কষ্ট পেতে পারে
	সবই দরকারি

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু কারা ?

খ. সমাজে কোন কোন ধরনের মানুষ একসাথে বসবাস করে ?

গ. কী কী কারণে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে আসতে পারে না ?

ঘ. সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা কী করতে পারি ?

ঙ. সমাজে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার গুরুত্ব কী ?

চ. অটিস্টিক শিশুর দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা

বাংলাদেশে প্রায় ৪৫ টিরও অধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস রয়েছে। যারা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১.১৩ ভাগ। তারা সাধারণত বাংলাদেশের পাবর্ত্য চট্টগ্রামসহ উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য-উত্তর ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করেন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বেশির ভাগই বাস করেন গ্রামাঞ্চলে। তাদের রয়েছে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি। সামাজিক সংগঠন, আচার-প্রথা, খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে তারা বাঙালিদের থেকে ভিন্ন। বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর নাম নিচে পড়ি;

এবার আমরা কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনে নিই :

চাকমা

জনসংখ্যার দিক থেকে চাকমা (যারা নিজেদের 'চাঙমা' বলেন) হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী । ২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫ লক্ষ ৫০ হাজার চাকমা রয়েছে। তারা পার্বত্য-চট্টগ্রামে (বিশেষত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে) বাস করেন।

জীবনধারা

চাকমাদের নিজেদের বর্ণমালা ও ভাষা আছে। আছে গান, নাচ ও সাহিত্য। নাদেং খারা, গুদো খারা এবং ঘিলা খারা (বিচি দিয়ে গুটি খেলা) এদের প্রিয় খেলা। চাকমা সমাজের প্রধান হচ্ছেন রাজা। যে কোনো বিষয়ে রাজার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রতিটি গ্রামে একজন গ্রামপ্রধান থাকেন যাকে চাকমারা 'কারবারি' বলেন। চাকমারা কাঠ ও বাঁশ দিয়ে মাচার মতো ঘর তৈরি করেন। ঘরগুলো শক্ত গাছের ওপর তৈরি। আর ঘরগুলোতে উঠার জন্য রয়েছে কাঠের বা বাঁশের সিঁড়ি। চাকমারা সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

চাকমাদের ঘরবাড়ি

গ্রামে বসবাসকারী চাকমারা সাধারণত 'জুমচাষ' ও অন্যান্য কৃষি কাজ করেন। 'জুম' চাষ হচ্ছে পাহাড়ের ঢালু জায়গায় গাছ পুড়িয়ে এবং পরিষ্কার করে ছোট দা দিয়ে গর্ত করে বীজ লাগানো। একই সাথে তারা বিভিন্ন ফসল ও সবজি চাষ করেন। চাকমারা বাঁশ ও বেত দিয়ে নানা ধরনের ঝুঁড়ি, পাখা, বাঁশি, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করেন। চাকমাদের প্রধান খাবার ভাত।

পোশাক

ঐতিহ্যগতভাবে চাকমারা নিজেদের তাঁতে নানা ধরনের নকশায় কাপড় বোনেন। চাকমা নারীদের পোশাকের নাম পিনন-হাদি। পিনন কোমর থেকে পা পর্যন্ত লম্বা অংশ। আর কোমরের ওপরের অংশটির নাম হাদি। ছেলেরা ও পুরুষরা এখন ফতুয়া ও লুঙ্গির মতো পোশাক পরেন।

চাকমা পোশাকে নারী ও পুরুষ

উৎসব

চাকমারা নানা উৎসব পালন করেন। বৌদ্ধ পূর্ণিমা হচ্ছে তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সাধারণত বৈশাখ মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। এছাড়াও তারা 'মাঘী পূর্ণিমা', 'কঠিন চীবর দান' উৎসব পালন করেন। চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে 'বিজু' যা বাংলা বছরের শেষ দুদিন ও নতুন বাংলা বছরের প্রথম দিন মোট তিনদিন ধরে পালন করা হয়। বিভিন্ন উৎসবে তারা ফুল দিয়ে ঘরবাড়ি সাজায়, শিশুরা বড়দের সম্মান জানায় ও আশীর্বাদ লাভ করে।

চাকমাদের উৎসব পালন

মারমা

জীবনধারা

ক্ষুদ্রজাতিসত্তার জনগণের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে চাকমাদের পরে দ্বিতীয় স্থানে আছেন মারমা । বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি এলাকায় অধিকাংশ মারমা বাস করেন। মারমা সমাজেও রাজা আছেন। এছাড়া গ্রামপ্রধান হচ্ছেন 'রোয়াজা বা কারবারি'।

মারমা ছেলে মেয়ে

মারমারা শক্ত খুঁটির উপর মাচা বানিয়ে বাস করেন। মারমা জনগোষ্ঠী জুমচাষ, মাছ ধরা, কাপড় ও চুরুট তৈরি করে ও তা বিক্রি করে আয় করেন। ভাত আর সিদ্ধ সবজি মারমাদের প্রধান খাবার । তবে তাদের প্রিয় খাবার হচ্ছে 'নাপ্পি' বা শুঁটকি মাছের ভর্তা।

অতীতে তারা বনজ সম্পদ থেকে ঔষধি গাছের মাধ্যমে চিকিৎসা নিতেন। বর্তমানে অবশ্য তারা আধুনিক চিকিৎসাও নিয়ে থাকেন।

মারমাদের পোশাক

পোশাক

মারমা নারী পুরুষের পোশাক হচ্ছে 'থামি' ও 'আংগি'। বর্তমানে নারী পুরুষেরা আধুনিক পোশাক পরেন।

উৎসব

মারমা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। প্রতিমাসে তারা 'ল্যাব্রে' নামে একটি উৎসব পালন

করেন। বর্মী ভাষায় 'ল্যাব্রে'র অর্থ হচ্ছে পূর্ণচন্দ্র বা পূর্ণিমা। জলের উৎসব তাদের আরও একটি অনুষ্ঠান। তারা বাংলা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন 'সাংগ্রেইন' উৎসব পালন করে থাকেন।

সাঁওতাল

জীবনধারা

বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় সাঁওতালরা বাস করেন। যেমন– দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগা, চাপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর জেলা। এছাড়া রংপুর বগুড়াসহ আরও কয়েকটি জেলায় সাঁওতাল জনগণ বসবাস করছেন। বাংলাদেশে প্রায় ২০ লাখের বেশি সাঁওতাল বাস করেন।

সাঁওতাল

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও কোনো বর্ণমালা নেই। সাঁওতালদের প্রধান খাবার ভাত। এছাড়া তারা মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদি খাবার খান। 'নলিতা' বা পাটশাক এদের একটি বিশেষ খাবার। সাঁওতাল নারী-পুরুষ সবাই অনেক কাজ করতে পারেন। বর্তমানে কৃষিই তাদের প্রধান পেশা। এছাড়া মাছ ধরা, চা বাগানের কাজ, কুটির শিল্পসহ তারা আরও নানা কাজ করে থাকেন। তবে বর্তমানে তারা শিক্ষিত হচ্ছেন এবং সব কাজেই তারা আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

পোশাক

সাঁওতাল নারীরা দুই খণ্ড কাপড় পরেন। উপরের অংশের নাম পাঞ্চি ও নীচের অংশের নাম পারহাট। সাঁওতাল নারীরা খোঁপায় ফুল পরতে ভালোবাসেন। সাঁওতাল পুরুষেরা আগে সাদা ধুতি পরতেন। বর্তমানে লুঙ্গি, গেঞ্জি, ধুতি ও প্রয়োজনে অন্যান্য পোশাকও পরেন।

উৎসব

সাঁওতালরা উৎসবপ্রিয় । বছরের প্রতিটি মাসই তারা শুরু করেন নাচ-গানে ভরপুর উৎসবের মধ্য দিয়ে। সাঁওতালরা বছরেপাঁচটি উৎসব বিশেষভাবে পালন করেন। সেগুলো হলো -

মাস	উৎসব
পৌষ	'সোহরায় উৎসব'– বছরে প্রধান ফসল তোলার পর পালন করা হয়।
মাঘ	ঘর বানানোর জন্য বন থেকে খড় কুড়ানোর উৎসব 'মাঘ সিম'।
ফাল্গুন	অমাবস্যায় বসন্তের উৎসব 'বসন্তোৎসব'।
আষাঢ়	'এর কংসিম'– প্রত্যেক পরিবার থেকে একটি মুরগি এনে পূজা দেওয়া।
ভাদ্র	'হাড়িয়ার সিম'– ফসলের জন্য বোঙাদের বারোয়ারি ভোগ দেওয়া।

মণিপুরি

জীবনধারা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে মণিপুরি। তাদের আদিবাস ভারতের আসামের মণিপুর রাজ্যে। বাংলাদেশে আসার পর প্রথমদিকে তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা, ময়মনসিংহের দূর্গাপুর ও ঢাকার তেজগাঁওতে বসতি স্থাপন করেন। তবে বর্তমানে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ জেলায় মণিপুরিরা বসবাস করেন। এর মধ্যে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে অধিকাংশ মণিপুরি বসবাস করেন।

মণিপুরিরা দুটি গোত্রে বিভক্ত।

১. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি
২. মৈ তৈ মণিপুরি

দুই গোত্রের ভাষাও গোত্রের নামে। মণিপুরি সংস্কৃতি খুব সম্মৃদ্ধ। নাচ হচ্ছে তাদের সংস্কৃতির অন্যতম অংশ । তারা সনাতন ধর্মের অনুসারী। 'মৈ তৈ পাঙন' নামে মুসলিম একটি মণিপুরি জনগোষ্ঠীও আছে। মণিপুরিদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, শুঁটকি, সবজি। তবে সামাজিকভাবে মাংস নিষিদ্ধ বলে তারা তা খান না। সবজির পাতা দিয়ে তারা এক ধরনের সালাদ খেতে পছন্দ করেন যার নাম 'সিঞ্চেডা'।

মণিপুরি নাচ

মণিপুরি জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগেরই পেশা কৃষি। তারা বিভিন্ন ধরনের ফসল ও সবজি চাষ করেন। তাদের ঘরে ঘরে আছে তাঁত শিল্প। জীবনযাপনের জন্য এখন সব পেশাতেই তারা প্রবেশ করছেন। মণিপুরিদের ঘরবাড়ি ছনের বা বাঁশের তৈরি । টিনের ঘর বা ইটের দালানও আছে। তারা ঘরবাড়ি খুব পরিষ্কার রাখেন।

পোশাক

মণিপুরিরা আগে নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরি করতেন। নারীরা 'লাহিং' (ঘাগড়ার মতো) আর 'আহিং' (ব্লাউজ), ওড়না পরেন। পুরুষরা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেন।

উৎসব

মণিপুরিরা প্রায় সারাবছরই উৎসবে মেতে থাকেন। নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তারা আনন্দ করেন। এছাড়া রথযাত্রা, দোলযাত্রা, হোলি উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি, রাসপূর্ণিমা ইত্যাদি উৎসব পালন করেন।

আবার পড়ি

১. বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টিরও অধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করেন।
২. গ্রামে বসবাসকারী চাকমারা 'জুম' চাষ করেন।
৩. মারমাদের নববর্ষের উৎসবের নাম 'সাংগ্রেইন'।
৪. মণিপুরি নাচ খুব বিখ্যাত।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের ছকটি পূরণ করতে বলবেন।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	পোশাক	খাদ্য	উৎসব
চাকমা			
মারমা			
সাঁওতাল			
মণিপুরি			

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা কত ?

ক. ৪০ টি খ. ৪৪ টি
গ. ৪৫ টি ঘ. ৪৫ টিরও অধিক

১.২ বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কোনটি ?

ক. মণিপুরি খ. চাকমা
গ. সাঁওতাল ঘ. গারো

১.৩ মারমাদের ধর্মের নাম কী ?

ক. বৌদ্ধ খ. হিন্দু
গ. ইসলাম ঘ. খ্রিষ্টান

১.৪ মণিপুরি সংস্কৃতির অন্যতম অংশ কী ?

ক. গান খ. পূজা-পার্বণ

গ. নাটক ঘ. নাচ

১.৫ 'হাড়িয়ার সীম' কোন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উৎসব ?

ক. চাকমা খ. সাঁওতাল

গ. মারমা ঘ. গারো

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ———— ভাগ।

খ. চাকমাদের গ্রামগুলোকে বলে ———————— ।

গ. সাঁওতালরা ———————— টি গোত্রে বিভক্ত।

ঘ. সাংগ্রেইন ———————— দের একটি উৎসব।

ঙ. বাংলাদেশে অধিকাংশ মণিপুরি ———————— জেলায় বাস করেন।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. মণিপুরিরা	৫ টি উৎসব পালন করে
খ. চাকমা নারীদের পোশাক	নাপ্পি
গ. সাঁওতালরা বছরে প্রধানত	১২ টি গোত্রে বিভক্ত
ঘ. মারমাদের প্রিয় খাবার	পিনন হাদি
	২টি গোত্রে বিভক্ত

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. জুম চাষ কাকে বলে ?

খ. চাকমা ও মারমাদের প্রধান উৎসবগুলো কী ?

গ. সাঁওতালদের জীবনধারা কেমন ?

ঘ. মণিপুরি সংস্কৃতির বর্ণনা দাও।

ঙ. বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রধান প্রধান পেশা কী ?

চতুর্থ অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার

নাগরিক

সাধারণভাবে রাষ্ট্রের কোনো সদস্যকে নাগরিক বলে। নাগরিক রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলে। রাষ্ট্রের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি। রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করি ও দায়িত্ব পালন করি। তাই আমরা বাংলাদেশের নাগরিক।

পৃথিবীর সব দেশের নাগরিকরা নিজ নিজ রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু অধিকার ভোগ করে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু অধিকার আছে। এখন আমরা নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে জানব।

নাগরিকের অধিকার

বিশ্বের সব রাষ্ট্রের নাগরিক নিজ নিজ রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। যেমন- চিকিৎসার সুবিধা, পড়ালেখার সুযোগ ইত্যাদি। নাগরিকের সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য এগুলো একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কাছ থেকে এসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়াকে বলা হয় নাগরিকের অধিকার। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এসব অধিকার পূরণ করা।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকার

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা সাধারণত রাষ্ট্রের কাছ থেকে তিন ধরনের অধিকার ভোগ করি। যেমন-

(১) সামাজিক অধিকার,

(২) রাজনৈতিক অধিকার ও

(৩) অর্থনৈতিক অধিকার।

সামাজিক অধিকার

সমাজে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য যেসব অধিকার অপরিহার্য সেসব অধিকারকে সামাজিক অধিকার বলে। নিচের ছকে আমাদের কয়েকটি প্রধান সামাজিক অধিকার জেনে নেই।

সামাজিক অধিকার		
বেঁচে থাকার অধিকার		জীবন রক্ষার অধিকার সকল অধিকারের মধ্যে অন্যতম। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদিসহ জীবনের নিরাপত্তা । বেঁচে থাকার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকদের এসব কিছুর অধিকার আছে।
শিক্ষার অধিকার		শিক্ষালাভের অধিকার নাগরিকের একটি প্রধান অধিকার। রাষ্ট্র তাই বিভিন্নভাবে নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।
সম্পত্তির অধিকার		রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করার অধিকার আছে।
চলাফেরার অধিকার		প্রত্যেক নাগরিকের দেশের ভিতরে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার আছে। এ কারণে আমরা কোনো রকম বাধা ছাড়া সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারি।
মত প্রকাশের অধিকার		দেশের সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। অতএব, আমরা পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ইত্যাদি জায়গায় নিজেদের মত প্রকাশ করব।
কর্মের অধিকার		রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কর্মের তথা কাজ করার অধিকার আছে। এর ফলে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারি।

ধর্ম পালনের অধিকার		নিজ নিজ ধর্ম পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। সে কারণেই আমরা বাংলাদেশের সব ধর্মের নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকি।
ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার		নিজ মাতৃভাষায় কথা বলা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। একইভাবে নিজ নিজ সংস্কৃতি চর্চা ও উৎসব অনুষ্ঠান করাও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ।
আইনের চোখে সবার সমান অধিকার		আইন অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিক সমান। তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, উঁচু, নিচু, পেশা, শারীরিক সামর্থ্য ইত্যাদি নির্বিশেষে সবার সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার আছে।

রাজনৈতিক অধিকার

রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং শাসনকার্যে নাগরিকদের অংশগ্রহণ করার অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। নিচে নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকারগুলো উল্লেখ করা হলো :

রাজনৈতিক অধিকার		
নির্বাচনের অধিকার		নির্বাচনে সকল নাগরিকের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার বোঝায়।
বসবাসের অধিকার		রাষ্ট্রের ভিতরে সকল নাগরিকের বসবাসের অধিকার আছে।
সরকারি চাকরি লাভের অধিকার		যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিকের চাকরি পাওয়ার অধিকার আছে।

বিদেশে নিরাপত্তা লাভের অধিকার		কোনো নাগরিক বিদেশে থাকা অবস্থায় বিপদে বা সমস্যায় পড়লে নিজ রাষ্ট্রের সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়া বা নিরাপত্তা দাবি করার অধিকার আছে।
ব্যাক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার		প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে সব কিছু করার অধিকার আছে। তবে সে অধিকার যেন অন্যের কোনো ক্ষতির কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক অধিকার

নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু অর্থনৈতিক অধিকারও আছে। জীবনধারণের জন্য কোনো কাজ করে রোজগার করার অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। সুষ্ঠুভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য এ অধিকারগুলো প্রয়োজন। নিচের ছকে কয়েকটি অর্থনৈতিক অধিকার পড়ি।

অর্থনৈতিক অধিকার		
আয় রোজগার করার অধিকার	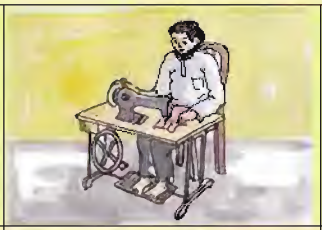	রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কাজ করে বা চাকরি করে আয় রোজগার করার অধিকার আছে।
ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার		যে কোনো কাজ করে সবার ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার আছে।
অবকাশ ছুটি লাভের অধিকার	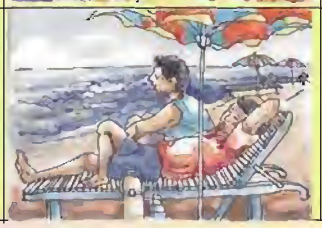	যে যেখানেই কাজ করুক, সবারই কর্মক্ষেত্রে অবকাশ ছুটি পাওয়ার অধিকার আছে।

নাগরিক অধিকারের গুরুত্ব

নাগরিক অধিকার নাগরিকদের উন্নত ও মানসম্মত জীবনযাপনে সহায়তা করে। যেমন- সামাজিক অধিকারগুলো আমাদেরকে শিক্ষা লাভ এবং সুস্থ জীবনযাপন করতে সহায়তা করে। আমাদের জীবনের উন্নতি ঘটায়। সমাজ জীবনকে সুন্দর করে। নিজের ভাষায় কথা বলার ও নিজের ধর্ম পালনের সুযোগ দেয়। বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে তোলে। রাজনৈতিক অধিকার আমাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে আমরা ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাই। অর্থনৈতিক অধিকার আমাদেরকে রোজগারের সুযোগ করে দেয়। ফলে আমরা আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারি।

সবার অধিকারকে সম্মান করি

নাগরিক হিসেবে সব ধরনের অধিকারগুলো আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই এগুলো আদায়ের জন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে । নিজেদেরকে উপযুক্ত করে গড়তে হবে। লেখাপড়া শিখতে হবে। প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে। সবার অধিকার পূরণে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমাদের সহায়তা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, অধিকারগুলো সব নাগরিকের। আমাদের পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকলে যেন এগুলো পায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে। অন্যের অধিকার নষ্ট হতে পারে এমন ধরনের কোনো কাজ করা আমাদের উচিত নয়।

আবার পড়ি

১. সাধারণভাবে রাষ্ট্রের কোনো সদস্যকে নাগরিক বলে।
২. নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাকে বলে নাগরিক অধিকার।
৩. নাগরিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক–এ তিন ধরনের অধিকার ভোগ করে।
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার আছে।
৫. আমরা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন থাকব। অন্যের অধিকারকেও শ্রদ্ধা করব।

পরিকল্পিত কাজ

১. নাগরিক অধিকারের তালিকা তৈরি করা।
২. নাগরিক অধিকারের ওপর পোস্টার/চার্ট তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করা।
৩. অধিকারের উপর ভিত্তি করে ভূমিকাভিনয় করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ সাধারণ অর্থে নাগরিক বলতে কাদের বোঝায় ?
ক. নারী খ. রাষ্ট্রের সদস্য
গ. শিশু ঘ. পুরুষ সদস্য

১.২ নিচের কোনটি সামাজিক অধিকার ?
ক. বেঁচে থাকা খ. আয় করা
গ. অবকাশ ছুটি পাওয়া ঘ. নির্বাচিত হওয়া

১.৩ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কোন ধরনের অধিকার ?
ক. সামাজিক খ. অর্থনৈতিক
গ. রাজনৈতিক ঘ. সাংস্কৃতিক

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. নাগরিক রাষ্ট্রের ———————— মেনে চলে।
খ. রাষ্ট্রের কাছে আমাদের সামাজিক, ———————— ও অর্থনৈতিক অধিকার আছে।
গ. নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার একটি ———————— সামাজিক অধিকার।
ঘ. রাষ্ট্র পরিচালনায় ———————— করার অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।
ঙ. সামাজিক অধিকার উন্নত ও ———————— জীবনযাপনে সহায়তা করে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে	সামাজিক অধিকার
খ. ধর্ম পালনের অধিকার	অর্থনৈতিক অধিকার
গ. ভোট দেওয়ার অধিকার	রাজনৈতিক অধিকার
ঘ. ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার	নাগরিক
	বিদেশি

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. নাগরিক কারা ?

খ. নাগরিক অধিকার কাকে বলে ?

গ. নাগরিকের সামাজিক অধিকারগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

ঘ. অর্থনৈতিক অধিকারের সুফল কী ?

ঙ. অন্যের অধিকার পূরণে আমাদের দায়িত্ব কী ?

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ

জীবনযাপনের জন্য আমরা অনেক কিছু ব্যবহার করি। আমরা ঘরবাড়িতে বাস করি। যানবাহনে যাতায়াত করি। রাস্তায় চলাচল করি। ফসলের জন্য জমি চাষ করি। শিল্পকারখানায় নানা দ্রব্য উৎপাদন করি। বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করি। যা কিছু আমাদের প্রয়োজন মেটায় সেসবকে সম্পদ বলে। সম্পদ প্রধানত দুপ্রকার। যথা–

১. সামাজিক সম্পদ ও

২. রাষ্ট্রীয় সম্পদ।

আমরা এখন এ দুধরনের সম্পদ সম্পর্কে জানব।

সামাজিক সম্পদ

সমাজ জীবনের নানা রকম প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষ বিভিন্ন সম্পদ গড়ে তোলে। এগুলোকে সামাজিক সম্পদ বলে। আমাদের চারপাশে অনেক সামাজিক সম্পদ রয়েছে। যেমন- বিদ্যালয়, পাঠাগার, হাসপাতাল, উপাসনালয়, রাস্তা, সেতু, সাঁকো। আমাদের আনন্দ লাভের জন্য রয়েছে খেলার মাঠ, পার্ক, ক্লাব ইত্যাদি। এগুলোও সামাজিক সম্পদ।

বিদ্যালয়

শিক্ষা লাভ করা আমাদের সামাজিক অধিকার। শিক্ষা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। পড়ালেখা শেখার জন্য মানুষ বিদ্যালয় গড়ে তুলেছে। আমাদের দেশে গ্রামে ও শহরে অনেক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে আমাদের মতো অনেক শিশু পড়ালেখা করে।

একটি বিদ্যালয়

হাসপাতাল

রোগ-ব্যাধি হলে চিকিৎসার প্রয়োজন। এজন্য মানুষ হাসপাতাল তৈরি করেছে। এখানে ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করেন। নার্স রোগীর সেবা-যত্ন করেন।

একটি হাসপাতাল

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মুসলমানরা মসজিদে নামাজ পড়েন। হিন্দুরা মন্দিরে পূজা-অর্চনা করেন। বৌদ্ধরা প্যাগোডায় এবং খ্রিস্টানরা চার্চে প্রার্থনা করেন। অন্যান্য ধর্মের মানুষ নিজ নিজ উপাসনালয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন।

মসজিদ

মন্দির

প্যাগোডা

গির্জা

রাস্তা

যাতায়াতের জন্য রাস্তা প্রয়োজন। পাকা রাস্তা, আধাপাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের রাস্তা রয়েছে। একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের জন্য মানুষ এসব রাস্তা ব্যবহার করে।

একটি রাস্তা

সেতু-সাঁকো

বিভিন্ন নদী, খাল ইত্যাদির ওপর সাঁকো ও সেতু রয়েছে। এসব সেতু ও সাঁকো দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে।

সেতু

সাঁকো

খেলার মাঠ

গ্রাম ও শহরে খেলার মাঠ রয়েছে। বিভিন্ন বয়সের মানুষ এসব মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, হাডুডু, কানামাছি, বউচি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা ইত্যাদি নানারকম খেলাধুলা করে।

খেলার মাঠ

একটি শিশুপার্ক

পার্ক

পার্কে নানা ধরনের গাছ ও ফুলের বাগান থাকে। অনেক পার্কে পুকুর অথবা লেক থাকে। আর থাকে আঁকাবাঁকা রাস্তা। মানুষ আনন্দ লাভের জন্য পার্কে বেড়াতে যায়। শিশুদের জন্যও বিভিন্ন স্থানে পার্ক রয়েছে। এগুলোকে শিশুপার্ক বলে।

এসব সামাজিক সম্পদ আমাদের নানা কাজে আসে। আমরা এসব সম্পদের ক্ষতি করব না। সবসময় এগুলো সুন্দর রাখার জন্য যত্ন নেব।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ

কিছু কিছু সম্পদ রয়েছে যা সরকার সরাসরি পরিচালনা করে। এ ধরনের সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে। রাষ্ট্র এসব সম্পদের মালিক। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের এসব সম্পদ ভোগ করার অধিকার রয়েছে। এবার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রীয় সম্পদ সম্পর্কে জানব। দেশের ভূমি, সাগর ও নদনদীর পানি, বন, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ, সড়ক, রেলপথ, রেলস্টেশন, সরকারি অফিস, আদালত, বড় বড় সেতু ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পদ।

পানি

প্রতিটি মানুষের জন্য পানি অত্যন্ত প্রয়োজন। পান করা, রান্না করা, গোসল করা, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা, চাষাবাদ ইত্যাদি কাজে সকলে পানি ব্যবহার করে। এছাড়া শিল্পকারখানা, ব্যবসায় বাণিজ্যসহ অনেক কাজে পানি ব্যবহার করা হয়। পানিপথে স্টিমার, লঞ্চ, নৌকা ইত্যাদিতে মানুষ যাতায়াত করে। মালামাল পরিবহন করে। পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ। সাগর, নদনদী এবং বড় বড় হাওর-বাঁওড় ইত্যাদি থেকে আমরা পানি পাই। শহরে যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাসা, অফিস-আদালত, দোকান, শিল্প-কারখানা সকল স্থানে পানি পৌঁছে দেওয়া হয়।

একটি নদী

একটি বন

বন

বনে অনেক রকম গাছ জন্মে। অনেক ধরনের পশু ও পাখি বাস করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য বন অত্যন্ত প্রয়োজন। বনের গাছ ও পশুপাখি মানুষের নানা প্রয়োজন মেটায়।

প্রাকৃতিক গ্যাস

আমরা রান্নার কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি। শিল্প কারখানা ও যানবাহনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনেও গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

গ্যাসের চুলা

বিদ্যুৎ

আমরা নানা কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি। বিদ্যুৎ আমাদের ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, শিল্পকারখানায় আলো দেয়। বিদ্যুৎ দিয়ে আমরা পাখা, টেলিভিশন, রেডিও, কম্পিউটার ইত্যাদি চালাই। শিল্পকারখানায় যন্ত্র চালাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। কৃষি জমিতে পানি সেচের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। আরও নানা কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিদ্যুৎকেন্দ্র

সড়ক

আমাদের দেশে শত শত কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। সড়ক পথে বিভিন্ন যানবাহনে আমরা দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করি। মালামাল আনা-নেওয়া করি।

একটি সড়ক

রেলপথ

আমাদের দেশে সড়ক পথের মতো দীর্ঘ রেলপথ রয়েছে। অসংখ্য মানুষ রেলগাড়িতে চলাচল করে। রেলগাড়িতে সহজে অনেক মালামাল আনা-নেওয়া করা যায়।

একটি রেলপথ

সরকারি অফিস

রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য সরকারি অফিস রয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন কাজে এসব অফিসে যায়।

সরকারি অফিস

বঙ্গবন্ধু সেতু

বড় সেতু

আমাদের দেশে বড় বড় নদী রয়েছে। অনেক নদীর উপর দীর্ঘ সেতু তৈরি করা হয়েছে। যেমন– বঙ্গবন্ধু সেতু, চীনমৈত্রী সেতু, লালনশাহ সেতু। এতে মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হয়েছে।

আমরা সামাজিক সম্পদের মতো রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রতি যত্ন নেব। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রয়োজনমতো ব্যবহার করব। কখনও কিছু অপচয় করব না। সড়ক, রেলপথ, অফিস, সেতু ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি করব না। এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করব। এগুলোর উন্নয়নে আমরাও অংশ নেব।

আবার পড়ি

১. যা কিছু আমাদের প্রয়োজন মেটায় সেসবকে সম্পদ বলে।
২. সম্পদ দুই প্রকার। যথা– (ক) সামাজিক সম্পদ ও (খ) রাষ্ট্রীয় সম্পদ।
৩. আমরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের যত্ন নেব। কোনো কিছুর ক্ষতি করব না।

পরিকল্পিত কাজ

১. আমাদের চারপাশে যেসব সামাজিক সম্পদ রয়েছে তার একটি তালিকা করি।
২. নিচের ছকে তোমার দেখা কয়েকটি রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম লেখ।

১.	২.
৩.	৪.

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ যা কিছু আমাদের প্রয়োজন মেটায় সেসবকে কী বলে ?

ক. দ্রব্য খ. সম্পদ
গ. জিনিস ঘ. সম্পত্তি

১.২ কোনটি সামাজিক সম্পদ ?

ক. বিদ্যালয় খ. পানি
গ. বন ঘ. নদী

১.৩ কোনটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ?

ক. স্কুল খ. সেতু
গ. বিদ্যুৎ ঘ. সাঁকো

১.৪ রেলপথ কোন ধরনের সম্পদ ?

ক. ব্যক্তিগত খ. সামাজিক
গ. সমষ্টিগত ঘ. রাষ্ট্রীয়

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. বিদ্যালয়, পাঠাগার, উপাসনালয় ইত্যাদি ———————— সম্পদ।

খ. আমাদের আনন্দ লাভের জন্য রয়েছে ———————— , পার্ক, ক্লাব।

গ. রোগ-ব্যাধি হলে চিকিৎসার জন্য মানুষ ———————— তৈরি করেছে।

ঘ. বন ———————— সম্পদ।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. পড়ালেখা শেখার জন্য	রাস্তা ব্যবহার করে
খ. যাতায়াতের জন্য মানুষ	সামাজিক সম্পদ
গ. পানি	যত্ন নেব
ঘ. সম্পদের প্রতি	বিদ্যালয় গড়ে তুলেছে
	একটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. সম্পদ কত প্রকার ও কী কী ?

খ. পাঁচটি সামাজিক সম্পদের নাম লিখ।

গ. পাঁচটি রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম লিখ।

ঘ. হাসপাতাল আমাদের কী কাজে লাগে ?

ঙ. আমরা কী কী কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি ?

চ. বিভিন্ন প্রকার সম্পদের প্রতি আমাদের করণীয় কী ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন পেশার মর্যাদা

সমাজে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে অনেক পেশার মানুষ রয়েছে। প্রত্যেক পেশার মানুষকে শ্রম দিতে হয়। আমরা আগের শ্রেণিতে কিছু পেশার মানুষ সম্পর্কে জেনেছি। আমরা এখন আরও কিছু পেশার মানুষ সম্পর্কে জানব।

বিচারক

প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয়। এরপরও কখনো কখনো কিছু মানুষ আইন অমান্য করে। কেউ কেউ অপরাধমূলক কাজ করে। এদের বিচারব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। বিচারক আদালতে তাদের বিচার করেন।

আদালতে বিচারক

আদালতে আইনজীবী

আইনজীবী

বিচার কাজে আইনজীবী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আদালতে দুই পক্ষেই আইনজীবী থাকেন। আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা আদালতকে সহায়তা করেন।

পুলিশ

দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ কাজ করে। অপরাধীকে ধরে বিচারের সম্মুখীন করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। শহরে সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিরাপদে চলাচলে তারা মানুষকে সহায়তা করে।

পুলিশ বাহিনী

একজন প্রকৌশলী

প্রকৌশলী

প্রকৌশলী নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। এসব যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। রাস্তা, সেতু, বড় বড় দালান ইত্যাদি তৈরিতে প্রকৌশলীর সহায়তা প্রয়োজন।

ব্যবসায়ী

ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের মালপত্র বেচাকেনা করেন। তাদের কাছ থেকে আমরা দরকারি জিনিসপত্র ক্রয় করি। বড় বড় ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেন এবং বিদেশে দেশের পণ্য রপ্তানি করেন।

নিজ প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ী

চাকরিজীবী

চাকরিজীবীরা সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কাজ করেন। মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং তথ্য জানতে এসব অফিসে যাতায়াত করেন।

নিজ কার্যালয়ে অফিসকর্মী

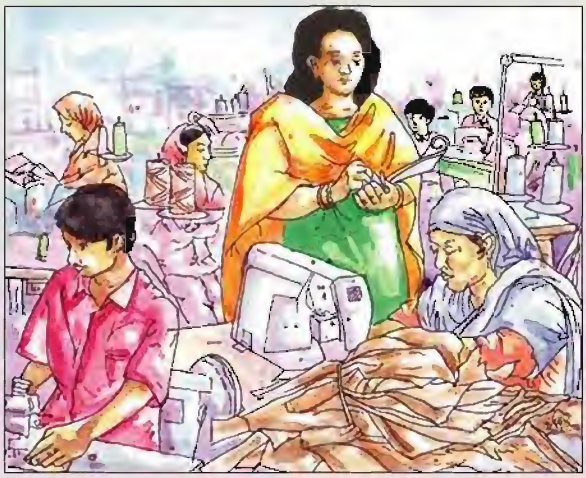

গার্মেন্টস্ শ্রমিক

শ্রমিক

শ্রমিকরা শিল্পকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এছাড়া বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন, নদীর ঘাট, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরে শ্রমিকরা কাজ করেন।

গৃহকর্মী

গ্রাম ও শহরের ঘরবাড়িতে গৃহকর্মী সেবা দিয়ে থাকেন। তারা গৃহের প্রয়োজন অনুযায়ী নানা রকম কাজ করেন।

একজন গৃহকর্মী

ধোপা

ধোপা কাপড় পরিষ্কার করেন। পোশাক ধোলাই করেন।

একজন ধোপা

একজন মাঝি

মাঝি

বাংলাদেশে অনেক অঞ্চলে নদনদী, খালবিল, হাওর-বাঁওড় রয়েছে। এখানে মানুষের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনে প্রচুর নৌকা ব্যবহার করা হয়। মাঝিরা এসব নৌকা চালান।

পরিচ্ছন্নকর্মী

পরিচ্ছন্নকর্মী স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অফিস, আদালত, রাস্তা ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন।

একজন পরিচ্ছন্নকর্মী

কোনো মানুষ তার যাবতীয় কাজ একা করতে পারে না। সমাজে মানুষ নানা প্রয়োজনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন পেশার মানুষ নানাভাবে একে অন্যের প্রয়োজন মেটায়। তাই সমাজে সব পেশার গুরুত্ব রয়েছে। সব পেশা বা কাজই মর্যাদার অধিকারী। আমরা কোনো কাজকে ছোট করে দেখব না। সব কাজকে সমানভাবে দেখব। শ্রমকে আমরা শ্রদ্ধা করব। সব পেশার মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করব। নিজেদের কাজ আমরা নিজেরা করার চেষ্টা করব। নিজেদের কাজ নিজেরা করে আমরা আনন্দ লাভ করব। নিজেদের কাজ করে মর্যাদাবান হব।

আবার পড়ি

১. সমাজের বিভিন্ন কাজে অনেক পেশার মানুষের প্রয়োজন।
২. কোনো মানুষ তার যাবতীয় কাজ একা করতে পারে না।
৩. মানুষ নানা প্রয়োজনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।
৪. সমাজে সব পেশার গুরুত্ব রয়েছে।
৫. শ্রমকে আমরা শ্রদ্ধা করব।
৬. নিজেদের কাজ করে মর্যাদাবান হব।

পরিকল্পিত কাজ

১. বাড়ি/বাসার আশেপাশে কে কোন পেশায় কাজ করে তার একটি তালিকা করা।
২. বিদ্যালয়ে কোন কোন পেশার মানুষ রয়েছেন তার তালিকা তৈরি করা।
৩. বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, আঙিনা পরিষ্কার করা ও বাগান করার কাজে একক ও দলগতভাবে অংশগ্রহণ করা ।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ আদালতে বসে বিচার করেন কে ?

ক. বিচারক　　খ. আইনজীবী
গ. পুলিশ　　ঘ. প্রকৌশলী

১.২ অপরাধীকে ধরে বিচারের সম্মুখীন করা কার প্রধান দায়িত্ব ?

ক. আইনজীবীর খ. প্রকৌশলীর

গ. পুলিশের ঘ. ব্যবসায়ীর

১.৩ কৃষিখেত, শিল্পকারখানায় ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কারা কাজ করেন ?

ক. ধোপা খ. শ্রমিক

গ. মাঝি ঘ. গৃহকর্মী

১.৪ নিজেদের কাজ নিজেরা করে আমরা কী লাভ করব ?

ক. অর্থ খ. দুঃখ

গ. কষ্ট ঘ. আনন্দ

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. মামলার বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষেই ———————— থাকেন।

খ. ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের ———————— বেচাকেনা করেন।

গ. কোনো মানুষ তার যাবতীয় কাজ ———————— করতে পারে না।

ঘ. শ্রমকে আমরা ———————— করব।

৩. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. পুলিশের কাজ কী কী ?

খ. প্রকৌশলী কী কী কাজ করেন ?

গ. শ্রমিকরা কোথায় কোথায় কাজ করেন ?

ঘ. সব পেশাই মর্যাদার অধিকারী কেন ?

ঙ. আমরা সব পেশার মানুষকে শ্রদ্ধা করব কেন ?

সপ্তম অধ্যায়

পরমতসহিষ্ণুতা

পরমতসহিষ্ণুতা

উপরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিশুরা কিছু বলছে। তাদের কথাগুলো পড়ি ও বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা একজন অন্যজনের মতামত ধৈর্য সহকারে শুনব ও শ্রদ্ধা করব। জোর করে একজনের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দিব না। বরং যে মতটি ভালো সেটি গ্রহণ করব। অর্থাৎ আমরা একজন আরেকজনের মতের প্রতি সহনশীল হব। এভাবে অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া এবং তাদের মতামতের প্রতি শ্রদধা দেখানকেই বলে পরমতসহিষ্ণুতা। পরমতসহিষ্ণুতা একটি প্রধান সামাজিক গুণ।

পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা

নিচের ঘটনাটি পড়ি।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে শ্রেণির সবাই মিলে শিক্ষকের কাছে শিক্ষা সফরে যাওয়ার জন্য বায়না ধরল। শিক্ষার্থীরা কোথায় যেতে চায় শিক্ষক এ বিষয়ে মত দিতে বললেন। কেউ বলল চিড়িয়াখানায় যাবে। কেউ যেতে চাইল শিশুপার্কে। অন্যরা আরও বিভিন্ন জায়গায় যেতে চাইল। কেউ কারো কথা ভালোভাবে শুনল না। সবাই নিজের পছন্দমতো জায়গায় যাওয়ার জন্য হট্টগোল করতে থাকল। নিজেদের মধ্যে দেখা দিল মতবিরোধ। ফলে তাদের আর শিক্ষা সফরে যাওয়া হলো না।

এবার নিচের প্রশ্নগুলো ভেবে দেখি–

১. শিক্ষার্থীদের কেন শিক্ষা সফরে যাওয়া হলো না?
২. তারা কি অন্যদের মত শুনেছে ও শ্রদ্ধা করেছে?
৩. তাদের কীভাবে মতামত প্রকাশ করা উচিত ছিল?
৪. পরমতসহিষ্ণু না হলে কী সমস্যা হতে পারে?

পরমতসহিষ্ণুতা একটি ভালো গুণ। এটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি আনে। মিলেমিশে চলতে সাহায্য করে। ব্যাক্তিকে কোনো বিষয়ে নিজের কথা বলার সুযোগ দেয়। আমরা প্রতিদিন বাড়ি, বিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের কাজ করি। কাজ করতে গিয়ে আমাদের অনেক রকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একটি বিষয়ে আমি এক রকম চিন্তা করতে পারি। অন্যরা হয়তো ভিন্নভাবে ভাবতে পারে। সবারই মতামতের গুরুত্ব আছে। আমরা 'আমাদের অধিকার' অধ্যায়ে জেনেছি সবার স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে। সবার মতামত থেকে অনেক ভালো কিছু বের হয়ে আসতে পারে। আমাদের সবাইকে পরমতসহিষ্ণু হতে হবে।

আমরা যদি অন্যের মতকে গুরুত্ব না দিই তাহলে অনেক সমস্যা হতে পারে। আমাদের সহপাঠী, বন্ধু, ভাইবোন ও অন্যদের সাথে মতবিরোধ বা ঝগড়া হতে পারে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেও সমস্যা হতে পারে। এর ফলে কাজ করতে অসুবিধা হবে। মিলেমিশে চলতে সমস্যা হবে। সুন্দর সমাজ গঠনে এগুলো বড় বাধা।

অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া

আমরা অনেক সময় অন্যরা যখন কথা বলে বা মত প্রকাশ করে তখন কথা বলি বা হট্টগোল করি। তাদের কথা শুনি না। এ ধরনের কাজ আমাদের করা উচিত নয়। কারণ এতে তারা মন খারাপ করতে পারে। তাই অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। তাদের মতামত ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে ও

একটি শিশু শ্রেণিকক্ষে কিছু বলছে আর অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে

শ্রদ্ধা করতে হবে। অনেক সময় কারো কোনো মতামত হয়তো আমাদের ভালো নাও লাগতে পারে। অথবা সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু তাই বলে তার মনে কষ্ট দিয়ে কোনো কথা বলা উচিত নয়। বরং তাকে সেটা ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে। মতামত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে। সুন্দরভাবে বিনয়ের সাথে নিজের মত বলতে হবে।

বাড়ি ও বিদ্যালয়ে আমাদের মত প্রকাশ

বাড়িতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। অনেক সময় কিছু কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেমন– কারো জন্মদিনে বা কোনো অনুষ্ঠানে কী করা হবে, কীভাবে পড়ালেখা করতে হবে, কী রান্না হবে, কী কাপড় কেনা হবে ইত্যাদি অনেক কিছু। এসব ক্ষেত্রে সম্ভবমতো আমরা আমাদের মত প্রকাশ করব। পরিবারের অন্যদের মত শুনব। সবার মতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সবার জন্য যেটি ভালো সেই মতটি গ্রহণ করব। একইভাবে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে (যেমন– বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন, বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজ, ইত্যাদি) সহপাঠীদের মতামত শুনব ও নিজের মতামত জানাব। খেলার মাঠে ও প্রতিবেশী বন্ধুদের সাথেও আমরা এ ধরনের পরমতসহিষ্ণুতা দেখাব। সকলের মতামতের গুরুত্ব দিব।

অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করি

আমরা সবাই যখন কোনো বিষয়ে মত দিই তখন অনেক মত তৈরি হয়। কিন্তু সবার মত একসাথে গ্রহণ করা যায় না। এসব মতের মধ্য থেকে যেগুলো সবার জন্য ভালো এবং বেশিরভাগ ব্যক্তি যে মতামতটি দেয় সেটি গ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় নিজের মতামতটি গ্রহণ নাও হতে পারে। তাতে মন খারাপ করার কিছু নেই। বরং অধিকাংশের মতামতকে মেনে নিয়ে ভালো মনে কাজ করতে হবে।

একটি শিশু ডাইরিতে পরমতসহিষ্ণু হওয়ার উপায় লিখছে

আমরা পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে জানলাম। বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ও যেখানে প্রয়োজন আমরা এটি মেনে চলব। এভাবে আমরা সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গড়তে পারি। এবার নিচের কাজটি করি।

আমি কীভাবে পরমতসহিষ্ণু হতে পারি সে সম্পর্কে ডাইরিতে লিখি।

আবার পড়ি

১. অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া এবং তাদের মতামতের প্রতি সহনশীল হওয়াকে বলে পরমতসহিষ্ণুতা।
২. আমরা নিজেদের মত প্রকাশ করব। অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দিব। সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করব।
৩. এটি একটি সামাজিক গুণ যা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি নিয়ে আসে।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বিষয়ে পরমতসহিষ্ণুতার অনুশীলন করবে।
২. শিক্ষার্থীরা পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের উপায়গুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ পরমতসহিষ্ণুতার মূলকথা কোনটি ?

ক. সবার মতের প্রতি সহনশীলতা খ. কেবল নিজের মত প্রকাশ করা
গ. নিজের মত অনুযায়ী কাজ করা ঘ. নিজের মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া

১.২ অন্যরা যখন মত প্রকাশ করে তখন আমাদের কী করা উচিত ?

ক. কথা বলা খ. হট্টগোল করা
গ. ধৈর্য সহকারে শোনা ঘ. নিজের মতো কাজ করা

১.৩ কাদের মতামত আমাদের গ্রহণ করা উচিত ?

ক. নিজের খ. পছন্দের ব্যক্তির
গ. একজন বা দুইজনের ঘ. অধিকাংশ ব্যক্তির

১.৪ পরমতসহিষ্ণুতার ফলে কী হয় ?

ক. শান্তি নষ্ট হয় খ. মতবিরোধ তৈরি হয়

গ. ঝগড়া-বিবাদ হয় ঘ. মিলেমিশে চলতে সাহায্য করে

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. অন্যের মতামতের প্রতি ———————— হওয়াকে বলে পরমতসহিষ্ণুতা।

খ. সকলকে স্বাধীনভাবে ———————— প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত।

গ. পরমতসহিষ্ণুতা একটি ———————— গুণ।

ঘ. অধিকাংশ ব্যক্তি যে মতামতটি দেয় সেটি ———————— করা উচিত।

ঙ. সবার মতামত শুনতে ও ———————— করতে হবে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. ধৈর্য সহকারে শুনব	পরমতসহিষ্ণুতার অভাব
খ. সামাজিক গুণ	অন্যের মতামত
গ. সবার জন্য ভালো মতামত	মতবিরোধ
ঘ. সুন্দর সমাজ গঠনে বড় বাধা	গ্রহণ করব
	পরমতসহিষ্ণুতা

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. পরমতসহিষ্ণুতা কাকে বলে ?

খ. পরমতসহিষ্ণু হওয়ার উপকারিতা কী ?

গ. পরমতসহিষ্ণু না হলে কী সমস্যা তৈরি হতে পারে ?

ঘ. পরমতসহিষ্ণু হওয়ার জন্য আমাদের কী করা উচিত ?

ঙ. বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে আমরা কীভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারি ?

অষ্টম অধ্যায়

নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি

আমরা সমাজে বাস করি। মা-বাবা, ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক, সহপাঠী এবং অন্যান্য সকলকে নিয়ে সমাজ গঠিত হয়। সমাজের ভিত্তি হলো সদস্যদের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা ও একসাথে মিলেমিশে চলা। এগুলো মানুষের ভালো গুণ। জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সমাজের সদস্যদের অবশ্যই বিভিন্ন নৈতিক ও সামাজিক গুণ থাকা প্রয়োজন।

নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলির গুরুত্ব

সমাজে আমরা কীভাবে চলব, অন্যের সাথে কেমন আচরণ করব এ সম্পর্কিত কিছু নিয়মকানুন ও রীতিনীতি আছে। যেমন-বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের আদর করা, প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে চলা, কারো বিপদে সাহায্য করা ইত্যাদি। এগুলো মেনে চলার মাধ্যমে সমাজের মঙ্গল হয়। আমরা ভালো আচরণ করতে শিখি। সমাজের সদস্যদের এসব ভালো আচরণকে বলা হয় সামাজিক গুণাবলি। সামাজিক গুণাবলি সমাজে ঐক্য, শান্তি, সম্প্রীতি ও সহযোগিতাবোধ সৃষ্টি করে। সকলকে মিলেমিশে চলতে সাহায্য করে। ফলে সমাজ সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

সামাজিক গুণাবলি ছাড়া মানুষের কিছু নৈতিক গুণ আছে। এগুলো মানুষ হিসেবে আমাদের সবারই থাকা প্রয়োজন। সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়বোধ, শিষ্টাচার, শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা ইত্যাদি হচ্ছে মানুষের কয়েকটি নৈতিক গুণ। নৈতিক গুণ মানুষকে ভালো ও আদর্শ মানুষ হতে সাহায্য করে। যেমন- সততা আমাদের সৎ পথে চলতে সাহায্য করে। নিয়মনিষ্ঠা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। ন্যায়বোধ আমাদের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে ও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে। শিষ্টাচারের কারণে আমরা মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করি। এসব নৈতিক গুণ আমাদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

নৈতিক ও সামাজিক গুণ সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য খুবই প্রয়োজন। আমরা পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এগুলো অনুসরণ করব।

নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলির চর্চা

নিচের গল্পটি পড়ি। রিপা কীভাবে নৈতিক ও সামাজিক গুণগুলো চর্চা করে তা ভালো করে পড়ি ও খাতায় লিখি।

রিপার গল্প

মা-বাবা, ছোট বোন, দাদু ও আরও অনেককে নিয়ে রিপাদের পরিবার। রিপা খুব ভালো মেয়ে। সে পরিবারে বড়দের শ্রদ্ধা করে, ছোট বোনকে স্নেহ ও আদর করে। সবার সাথে মিলেমিশে চলে। বাড়ির সদস্যদের নানা কাজে সাহায্য করে। সে বাড়িতে আরও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে। দাদুকে যত্ন করেও ওষুধ খাওয়ায়। সময়মতো পড়ালেখা, খেলাধুলা ও অন্যান্য কাজ করে। সে বাড়ির কাজে সহায়তাকারী লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। সময় পেলে তাদের পড়ালেখা শেখায়।

রিপা দাদুকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে

রিপা সময়মতো বিদ্যালয়ে যায়। শিক্ষকদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। তাঁদের আদেশ উপদেশ মেনে চলে। সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে ও মিলেমিশে চলে। সে সবসময় সত্য কথা বলে ও ভালো কাজ করার চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ের দারোয়ান, আয়া ও অন্যান্য সকলকে সম্মান করে। কোনো সহপাঠীর পড়ালেখায় বা অন্য কোনো সমস্যা হলে সাহায্য করে। সে বিদ্যালয়ে কখনও কারো সাথে খারাপ আচরণ করে না। কারো

রিপা শিক্ষককে সালাম দিচ্ছে

জিনিস না বলে নেয় না। কাউকে মনে কষ্ট দিয়ে কোনো কথা বলা বা কাজ করে না। কেউ ভালো কাজ করলে প্রশংসা করে। ধন্যবাদ দেয়। হঠাৎ কোনো ভুল করলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে।

রিপা খাবার হাতে পাশের বাড়িতে যাচ্ছে

পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে রিপা ও তার পরিবারের সুসম্পর্ক রয়েছে। সে পাড়ার বড়দের সম্মান করে। সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে খেলাধুলা করে। প্রতিবেশীদের মনে কোনো কষ্ট দেয় না। প্রতিবেশীর কোনো সমস্যা হলে রিপা ও তার মা-বাবা তাদের সাহায্য করে। তাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে প্রতিবেশীদের দাওয়াত দেয়। বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে প্রতিবেশীদের বাড়িতে পাঠায়। তারা এলাকার নিয়মকানুন মেনে চলে। কেউ মনে কষ্ট পাবে এমন কোনো কথা বলে না। এমন কোনো কাজ করে না যাতে প্রতিবেশীর অসুবিধা হয়।

রিপার গল্পটি থেকে আমরা বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক গুণ সম্পর্কে জানলাম। এগুলো ভালো কাজ। তাই রিপার মতো আমাদেরও এ গুণগুলো অর্জন ও চর্চা করতে হবে। তাহলে আমাদের সবার জীবন সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারব।

ভালো কাজ করি, মন্দ কাজ পরিহার করি

আমরা অনেক সময় না বুঝে বা ইচ্ছে করে এমন অনেক কাজ করি যার ফলে অনেকের অনেক সমস্যা হয়। যেমন কেউ ঘুমালে বা পড়তে বসলে জোরে শব্দ করি। অনেক জোরে রেডিও, টিভি ইত্যাদি চালাই। না বলে হয়তো কারো জিনিস নিই। সময়ের কাজ সময়ে করি না। অন্যকে বকা দিই। সহপাঠীদের নিয়ে অযথা কৌতুক করি। অনেক সময় বাড়ির কাজে সহায়তাকারীদের সাথে ভালো আচরণ করি না। কেবল আনন্দ করার জন্য অন্যদের ক্ষতি করি। এগুলো খারাপ কাজ। এর ফলে অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ হয়। অনেকের ক্ষতি হয়। ফলে সমাজের শান্তি নষ্ট হয়। তাই এসব কাজ করা আমাদের উচিত নয়। আমরা ভালো কাজ করার চেষ্টা করব।

আমরা ভালো ও মন্দ কাজ সম্পর্কে জানলাম। এবার নিচের কোন কাজগুলো আমাদের করা উচিত এবং কোনগুলো করা উচিত নয় চিহ্নিত করি। যেগুলো করা উচিত তার পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই ও যেগুলো করা উচিত নয় সেগুলোর পাশে ক্রস (X) চিহ্ন দিই।

বাড়ির কাজে সহায়তাকারীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা।	
কোনো সহপাঠী পেন্সিল আনতে ভুলে গেলে পেন্সিল দিয়ে সাহায্য করা।	
বাড়িতে সবাইকে সাধ্যমতো কাজে সাহায্য করা।	
কাউকে মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলা।	
অন্ধ ব্যক্তিকে রাস্তা পার হতে সাহায্য না করা।	
নিজের কাজ নিজে করা।	

আমরা এভাবে ভালো কাজ ও মন্দ কাজ চিহ্নিত করব। প্রতিদিন কিছু ভালো কাজ করব এবং মন্দ কাজকে না বলব।

আবার পড়ি

১. সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের নৈতিক ও সামাজিক গুণ অর্জন করতে হবে। এছাড়া আমাদেরকে ভালো ও মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝতে হবে ।
২. প্রতিদিন ভালো কাজ করতে হবে ও খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ

১. দলগতভাবে বইয়ের বিষয়বস্তু এবং নিজেদের জানা অভিজ্ঞতা থেকে সামাজিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করা।
২. সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির উপর যে কোনো ঘটনা বা গল্প অভিনয় করে উপস্থাপন করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ সমাজের সদস্যদের ভালো আচরণকে কী বলে ?

ক. দায়িত্ববোধ খ. সামাজিক গুণ
গ. ন্যায়বোধ ঘ. শৃঙ্খলাবোধ

১.২ কোনটি নৈতিক গুণ ?

ক. বিপদে সাহায্য করা খ. মিলেমিশে চলা

গ. অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া ঘ. সত্যবাদিতা

১.৩ কেউ ঘুমালে বা পড়তে বসলে জোরে শব্দ করা একটি–

ক. ভালো কাজ খ. মন্দ কাজ

গ. সামাজিক গুণ ঘ. নৈতিক গুণ

১.৪ সামাজিক গুণাবলির উপকারিতা কী ?

ক. সমাজে শান্তি আনে খ. সম্প্রীতি নষ্ট করে

গ. স্বার্থপর হতে শেখায় ঘ. মন্দ কাজে উৎসাহিত করে

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. সমাজের সদস্যদের ভালো ———————— বলা হয় সামাজিক গুণাবলি।

খ. মানুষ হিসেবে আমাদের সবার ———————— গুণ থাকা উচিত।

গ. সামাজিক গুণ সমাজে শান্তি ও ———————— বজায় রাখে।

ঘ. না বলে কারো জিনিস নেওয়া একটি ———————— মন্দ কাজ।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. সবার সাথে মিলেমিশে চলা	নৈতিক গুণ
খ. মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে	শিষ্টাচার
গ. সমাজের সদস্য	ন্যায়বোধ
ঘ. ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে	সামাজিক গুণ
	আমরা সবাই

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. সামাজিক গুণাবলি কাকে বলে ? দুটি সামাজিক গুণাবলির উদাহরণ দাও।

খ. আমাদের সামাজিক গুণাবলি অর্জন করা প্রয়োজন কেন ?

গ. নৈতিক গুণাবলির গুরুত্ব কী ?

ঘ. রিপার গল্প অনুযায়ী সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির তালিকা তৈরি কর।

ঙ. আমাদের কেন মন্দ কাজ করা উচিত নয় ?

নবম অধ্যায়

এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

আমরা কেউ কেউ গ্রামে বাস করি। আবার কেউ কেউ শহরে বাস করি। আমাদের বসবাসের স্থান এবং তার আশপাশের স্থান নিয়ে এক একটি এলাকা গড়ে ওঠে। প্রত্যেকের বসবাসের এলাকাকে তার নিজ এলাকা বলা হয়। গ্রামাঞ্চলে নিজ এলাকা বলতে পাড়া, গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়নকে বোঝায়। আর শহরে নিজ এলাকা বলতে পাড়া, মহল্লা ও ওয়ার্ডকে বোঝায়।

ভালোভাবে বসবাসের জন্য নিজ এলাকা উন্নত হওয়া দরকার। এজন্য সেখানে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। একটি উন্নত গ্রামাঞ্চলে নিচের সুযোগ-সুবিধাগুলো থাকা প্রয়োজন–

১. যাতায়াতের জন্য রাস্তা-ঘাট, সেতু, সাঁকো ইত্যাদি	৬. কয়েকটি পুকুর
২. নিরাপদ পানি পাওয়ার জন্য টিউবওয়েল	৭. ফসলের জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা
৩. প্রতি বাড়িতে সেনিটারি পায়খানা	৮. বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৪. ময়লা-আবর্জনা ফেলার কতগুলো নির্দিষ্ট জায়গা	৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
	১০. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
	১১. হাটবাজার
৫. জলাবদ্ধতা মুক্ত থাকার জন্য নালা ও খাল	১২. খেলার মাঠ ইত্যাদি।

একটি উন্নত গ্রাম এলাকা

ভালোভাবে বসবাসের জন্য শহর এলাকাতেও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। যেমন–

১. চলাচলের প্রশস্ত রাস্তা	৭. রাস্তার বাতি
২. ময়লা নিষ্কাশনের ড্রেন বা নালা	৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৩. ময়লা-আবর্জনা রাখার ডাস্টবিন	৯. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
৪. নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	১০. বাজার
৫. বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	১১. পার্ক
৬. গ্যাস ব্যবস্থা	১২. খেলার মাঠ ইত্যাদি।

একটি উন্নত শহর এলাকা

অনেক এলাকায় সব সুযোগ-সুবিধা থাকে না। কোনো এলাকায় হয়তো দরকার মতো রাস্তা, সেতু, সাঁকো নেই। মানুষের যাতায়াতের সমস্যা হয়। নিরাপদ পানির ব্যবস্থা না থাকায় মানুষ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকলে পরিবেশ দূষিত হয়। তাতে রোগ-জীবাণু ছড়ায়। খালের অভাবে যেখানে-সেখানে পানি জমে থাকে। তাতে ফসলের ক্ষতি হয়। মশা-মাছি জন্মে। ডাস্টবিন ও ড্রেনের অভাবে জীবন যাপন অস্বাস্থ্যকর হয়। খেলার মাঠ, পার্কের অভাবে মানুষ বিনোদন লাভে বঞ্চিত হয়।

আমাদের এলাকায় যেসব সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে তা নিচের ছকে লিখি।

১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

এলাকার উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা দরকার। এগুলো গড়ে তোলার জন্য এলাকার লোকজনকে বলব। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কমিশনারের সাথে যোগাযোগ করব।

সকলে মিলে এলাকার রাস্তা তৈরি করছে

এলাকায় রাস্তা, সেতু, সাঁকো ইত্যাদি তৈরির কাজ শুরু হলে আমরাও তাতে অংশ নেব। এগুলো ছাড়াও আমরা এলাকার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেব। কোনো কোনো এলাকায় ভাঙা রাস্তা, সেতু, সাঁকো ইত্যাদি দেখা যায়। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলো দিনে দিনে নষ্ট হতে থাকে। ফলে এগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয়।

আমাদের এলাকায় যেসব সুযোগ সুবিধা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নিচের ছকে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি

১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

এলাকার উন্নয়ন টিকিয়ে রাখার জন্য এগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার। এ বিষয়ে এলাকার মানুষকে সচেতন করব। এসব মেরামতের কাজে নিজেরাও অংশ নেব।

সকলে মিলে সেতু মেরামত করছে

এলাকার যাবতীয় সম্পদ আমরা যত্নের সাথে ব্যবহার করব। সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব দেব। এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজে অংশ নেব। এলাকা সুন্দর রাখার জন্য গাছপালা লাগাব। বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আঙিনায় ফুলের বাগান করব। আমরা টবে ফুলের গাছ লাগাব। এভাবে সকলে মিলে আমরা নিজ এলাকাকে একটি উন্নত এলাকায় পরিণত করব।

আবার পড়ি

১. প্রত্যেকের বসবাসের এলাকাকে তার নিজ এলাকা বলা হয়।
২. নিজ এলাকায় ভালোভাবে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার।
৩. অনেক এলাকায় কিছু সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকে। সকলে মিলে এসব সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা দরকার।
৪. এলাকার কোনো কোনো রাস্তা, সেতু, সাঁকো ইত্যাদি ভেঙে যেতে পারে। এগুলো মেরামতে আমরা অংশগ্রহণ করব।
৫. আমরা মানুষকে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে সচেতন করব।
৬. এলাকা সুন্দর রাখার জন্য গাছ লাগাব ও ফুলের বাগান তৈরি করব।
৭. সকলে মিলে আমরা নিজ এলাকাকে একটি উন্নত এলাকায় পরিণত করব।

পরিকল্পিত কাজ

১. এলাকায় কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করা দরকার, তার তালিকা তৈরি করা। এসব কাজে তুমি কীভাবে অংশগ্রহণ করবে তা লেখ।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ এলাকায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা না থাকলে কী হয় ?
ক. মানুষের রোগ-ব্যাধি হয় খ. গোসলের সমস্যা হয়
গ. ফসলে সেচ ব্যাহত হয় ঘ. কাপড়-চোপড় ধুতে সমস্যা হয়

১.২ এলাকায় খালের অভাবে কী হয় ?
ক. মাছের সংকট দেখা দেয় খ. যাতায়াতে অসুবিধা হয়
গ. জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় ঘ. খাবার পানির সংকট দেখা দেয়

১.৩ শহরের উন্নত পরিবেশের জন্য কোনটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ?
ক. গাছপালা খ. খাল
গ. নদী ঘ. ড্রেন

১.৪ গ্রাম অঞ্চলে নিরাপদ পানির জন্য কী প্রয়োজন ?
ক. পুকুর খ. নদী
গ. খাল ঘ. টিউবওয়েল

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. ভালোভাবে বসবাসের জন্য নিজ এলাকা ———————— হওয়া প্রয়োজন।

খ. খেলার মাঠ, পার্কের অভাবে মানুষ ———————— লাভে বঞ্চিত হয়।

গ. আমরা এলাকার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজে ———————— নেব।

ঘ. সকলে মিলে আমরা নিজ এলাকাকে একটি ———— এলাকায় পরিণত করব।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. প্রত্যেকের বসবাসের এলাকাকে	আমরা যত্নের সাথে ব্যবহার করব
খ. জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে	আমরা অংশ নেব
গ. এলাকার যাবতীয় সম্পদ	ফুলের বাগান তৈরি করব
ঘ. এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজে	নিজ এলাকা বলা হয়
	মশা-মাছি জন্মে

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. গ্রামাঞ্চলে নিজ এলাকা বলতে কী বোঝায় ?

খ. শহরাঞ্চলে নিজ এলাকা বলতে কী বোঝায় ?

গ. গ্রামাঞ্চলে উন্নত এলাকার যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার তার পাঁচটি উল্লেখ কর।

ঘ. শহরাঞ্চলে উন্নত এলাকার যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার তার পাঁচটি উল্লেখ কর।

ঙ. কোনো এলাকায় দরকারমতো সুযোগ-সুবিধা না থাকলে কী কী সমস্যা হয় তার তিনটি উল্লেখ কর ?

চ. নিজ এলাকায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলার জন্য আমরা কী কী করতে পারি ?

ছ. নিজ এলাকা সুন্দর রাখার জন্য আমরা কী কী করব ?

দশম অধ্যায়

দুর্যোগ ও দুর্যোগ মোকাবেলা

আমরা জেনেছি নানা কারণে পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের কারণে নানা রকম খারাপ প্রভাব পড়ছে। পরিবেশ দূষণের কারণে অনেক সময় বিভিন্ন দুর্যোগ হয়ে থাকে। তাই এবার আমরা বিভিন্ন দুর্যোগ ও এগুলোর কারণ সম্পর্কে জানব। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের দুর্যোগ ঘটে। সাধারণত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এই ধরনের দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণে ঘটে থাকে। আবার মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কারণেও অনেক সময় দুর্যোগ বেড়ে যেতে পারে। যেমন– গাছপালা কেটে ফেললে পরিবেশ দূষণ হয়। আবার গাছপালা কম থাকলে ঝড় ও বন্যার সময় মানুষের বেশি ক্ষতি হয়। তাই দুর্যোগকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন–

(১) প্রাকৃতিক ও

(২) মানবসৃষ্ট।

নিচের ছকে বাংলাদেশের প্রধান দুর্যোগগুলোর নাম লিখি

১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	

আমরা এখন বাংলাদেশের কয়েকটি দুর্যোগ সম্পর্কে জানব।

বন্যা

বর্ষাকালে পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে মানুষ, পশুপাখি, ঘরবাড়ির যে ক্ষতি হয় সেই অবস্থাকে আমরা বন্যা বলি। সাধারণত আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যা হয়। বন্যা

বাংলাদেশের একটি প্রধান দুর্যোগ। ১৯৮৭ সাল থেকে বাংলাদেশে কয়েকটি ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০২, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ভয়াবহ বন্যা হয়। এই বন্যা দেশের প্রায় সব জেলার মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে। ফসল, পশু, মাছ, গাছপালা, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবকিছুই তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘরবাড়ি ডুবে যায় বলে মানুষের থাকতে অনেক কষ্ট হয়। তখন সবাই উঁচু জায়গায় চলে যায়। কেউ আশ্রয়কেন্দ্রে, কেউ রাস্তায়, কেউবা স্কুলঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

বন্যার সময় বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনেক এলাকার শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। অনেক জায়গায় রাস্তা পানিতে ডুবে থাকে বলে শিশুরা স্কুলে আসতে পারে না। আবার অনেক স্কুলে মানুষ আশ্রয় নেবার কারণে স্কুল বন্ধ থাকে। অনেকের বাড়ি পানিতে ডুবে গেলে শিশুদের বই-খাতা পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তারা পড়ালেখা করতে পারে না। বন্যার সময় শিশুরা পরিবারের সাথে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যায়।

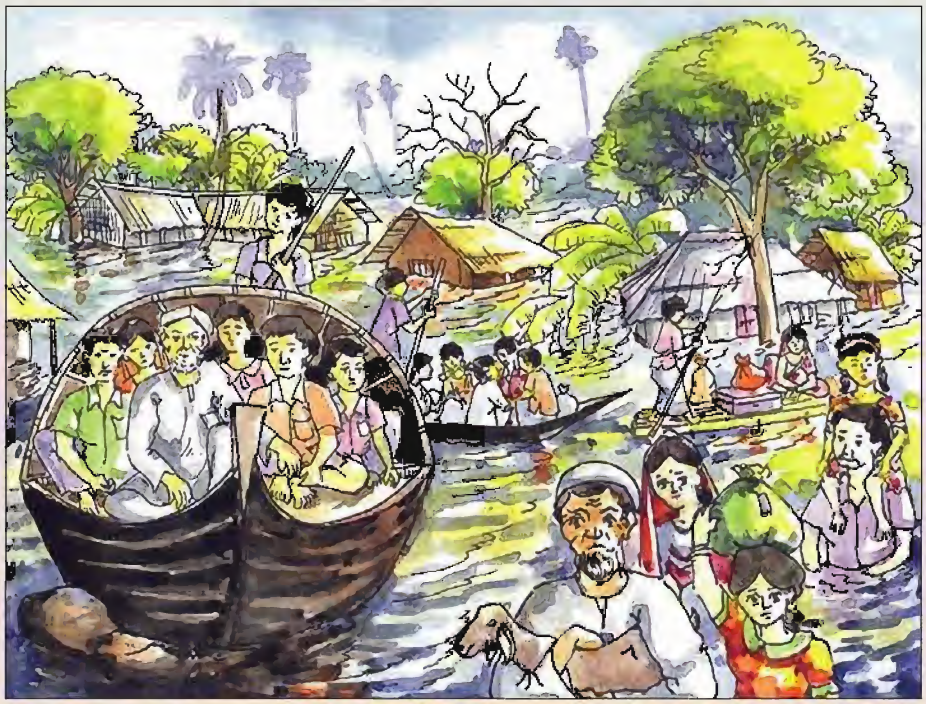

বন্যার ছবি

বন্যা হলে ঠিকমতো খাবার পাওয়া যায় না, বিশুদ্ধ পানিও থাকে না। মানুষ যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে। তখন অনেক অসুখ দেখা যায়। বন্যার পর সবকিছু ঠিক হতে দুই এক মাস লেগে যায়। তাই বন্যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর।

বন্যার কারণ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং প্রাকৃতিক কারণে বন্যা হয়। আবার মানুষও বন্যার তীব্রতা বাড়াতে পারে। যেমন– গাছ কেটে ফেলে। যেখানে-সেখানে রাস্তা, ঘরবাড়ি বা বাঁধ তৈরি করে। বর্ষার পানি বেড়ে জলাবদ্ধতার তৈরি হয়। এ কারণে বন্যার পানি সহজে নামতে পারে না।

বন্যা মোকাবেলা

বাংলাদেশে ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে বন্যা হয়। বন্যাকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কিন্তু বন্যাকে যাতে আমরা মোকাবেলা করতে পারি সে বিষয়ে কিছু প্রস্তুতি নেওয়া যায়। যেমন–

- নিয়মিত রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে আবহাওয়া সম্পর্কে খবর শুনব।
- মা-বাবা, শিক্ষক, বন্ধু সবার সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা বলব।
- বাড়ির কাছে খাল-নদীতে চিহ্ন দিয়ে বাঁশ-লাঠি পুঁতে রাখব যাতে বুঝতে পারি পানি কতটুকু বাড়ল।
- পানি তাড়াতাড়ি বাড়লে বাড়ির সবাই মিলে নিরাপদ স্থান বা আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নেব।
- মা-বাবা ও পরিবারের সবাই মিলে বন্যার আগে ও বন্যার সময়ের প্রস্তুতি নেব।
- নিজের বই খাতা, ব্যবহার্য দ্রব্য যাতে বন্যার পানিতে ভিজে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখব।
- মনে সাহস রাখব এবং ধৈর্যের সাথে দুর্যোগ মোকাবেলা করব।
- বন্যার আগে শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি জমিয়ে রাখব।
- সব সময় নিরাপদে থাকার চেষ্টা করব।

ঘূর্ণিঝড়

বাংলাদেশের দুর্যোগগুলোর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় অন্যতম। সাধারণত বর্ষা মৌসুমের আগে সাগরের উপরের দিকে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের যে এলাকাগুলো সমুদ্রের কাছাকছি সেখানেই বেশি ঘূর্ণিঝড় হয়। চিত্রে আমরা দেখে নেব বাংলাদেশের কোন এলাকাগুলোতে বেশি ঘূর্ণিঝড় হয়।

যেসব এলাকায় ঘূর্ণিঝড় হয় সেখানকার মানুষের সম্পদ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালার অনেক ক্ষতি হয়। ঝড়ে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় বা ভেঙে ফেলে। বাংলাদেশ স্বাধীন

হবার এক বছর আগে ১৯৭০ সালে একবার খুব ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। আর স্বাধীনতার পর ১৯৯১ সালে এবং ২০০৭ সালে দুবার ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়।

সাধারণত প্রাকৃতিক কারণে ঘূর্ণিঝড় হয়। এই ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়। কোনো এলাকায় গাছপালা বেশি থাকলে সেখানে অনেক জোরে বাতাস হলে তা গাছে লাগে। ফলে

ঘূর্ণিঝড়ের ছবি

ঘরবাড়ি ও মানুষের ক্ষতি কম হয়। কিন্তু বর্তমানে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে বলে একটু জোরে ঝড় হলেই তা মানুষের বাড়িঘর উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও অনেক ক্ষতি করছে।

ঘূর্ণিঝড় ভয়ঙ্কর হলে সাগরের ঢেউ অনেক উঁচু হয়ে মানুষের ঘরবাড়ি, পশুপাখি, রাস্তাঘাট ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এটাকে বলে জলোচ্ছ্বাস। আর এই জলোচ্ছ্বাস ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা

যারা ঘূর্ণিঝড় বেশি হওয়া এলাকায় বাস করে তারা বিভিন্ন সময়ে সংকেত পেয়ে থাকে। যেমন– স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ১ নম্বর থেকে মহাবিপদ সংকেত ১০ নম্বর। বিভিন্ন নম্বরের সংকেতের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা হয়। এছাড়া যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে

যান তারাও এই সংকেত শুনে সতর্ক হন। রেডিও, টেলিভিশন এবং বিভিন্ন খবরের কাগজে সংকেত প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে সবাই সতর্ক হতে পারেন। এখন আমরা দেখব ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় আমরা নিজেরা কী করতে পারি–

- নিয়মিত সংকেত শুনব, অন্যদেরকে জানাব ও নিজেরা সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেব।
- আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ কোনো স্থানে যাবার আগে নিজেদের বইপত্র, অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখব। মা-বাবার সাথে মিলেমিশে কাজ করব।
- বড়দের কথা শুনে চলব এবং সবসময় নিরাপদ স্থানে থাকব।

আগুন লাগা

মানুষের কারণে যে দুর্যোগ হয় তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো আগুন লাগা। একটু অসাবধান হলেই আগুন লেগে ঘরবাড়ি, অন্যান্য সম্পদ, মানুষ সবকিছু পুড়ে শেষ হয়ে যেতে পারে। যে কোনো সময় আগুন লাগতে পারে। তবে বাংলাদেশে প্রধাণত শুকনো মৌসুম যেমন– শীত ও বসন্তকালে আগুন লাগার ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। গ্রামাঞ্চলে এ সময়গুলোতে আগুনের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। আস্তে আস্তে আগুন থেকে সৃষ্ট এ ধরনের দুর্ঘটনার পরিমান বেড়ে যাচ্ছে। শহরের বস্তি, গার্মেন্টস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা যেসব এলাকায় বেশি লোকজন বসবাস করে সেসব জায়গায় আগুন লেগে দুর্ঘটনার পরিমান বেশি হচ্ছে।

আগুন লাগার ছবি

আগুন লাগার কারণ

নানা কারণে আগুন লাগতে পারে। যেমন–

- রান্নার পরে চুলার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে না দিলে
- সিগারেট, বিড়ি, হুকার আগুন থেকে
- গ্রামে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আগুন নেওয়ার সময়
- ঘরে কুপি, হারিকেন, মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখলে
- বাড়ির বিদ্যুতের লাইনে সমস্যা থাকলে
- কারখানার দাহ্য পদার্থ (যে জিনিসে সহজে আগুন ধরে) থেকে
- শিশুরা আগুন নিয়ে খেলা করলে বা আতশবাজি ফোটাতে গেলে

আগুন লাগা মোকাবেলা

এ রকম নানাবিধ কারণে আগুন লাগতে পারে। অন্যান্য দুর্যোগ সহজে মোকাবেলা করতে না পারলেও আমরা আগুন লাগা প্রতিহত করতে পারি। যেসব কাজ করলে আগুন লাগে আমরা সেগুলো করব না। আর যদি কোথাও আগুন লেগে যায় তাহলে আমরা ভয় না পেয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করব। আগুনে শরীরের কোনো জায়গা পুড়ে গেলে সেখানে ১০ মিনিট ধরে পানি ঢালব ও দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাব। কোনো সম্পদ রক্ষা করতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিব না।

আবার পড়ি

১. বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের কারণে নানা রকম খারাপ প্রভাব পড়ছে।
২. বাংলাদেশে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় বেশি হয়।
৩. মানুষের অসাবধানতার কারণে যে কোনো সময় আগুন লাগতে পারে।
৪. বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকব।

পরিকল্পিত কাজ

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান দুর্যোগের তালিকা তৈরি করা।
২. শিক্ষার্থীরা যেসব দুর্যোগ মোকাবেলা করেছে সেগুলোর বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা।
৩. রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকায় উপস্থাপিত দুর্যোগ প্রতিরোধমূলক নির্দেশনা শোনা।
৪. শিশুদের দুর্যোগ মোকাবেলা কৌশল অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ দুর্যোগকে কত রকমে ভাগ করা যায় ?

ক. এক　　খ. দুই

গ. তিন　　ঘ. চার

১.২ বাংলাদেশে কোন সময় বন্যা হয় ?

ক. আষাঢ় থেকে আশ্বিন　　খ. বৈশাখ থেকে আশ্বিন

গ. জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র　　ঘ. আশ্বিন থেকে পৌষ

১.৩ বাংলাদেশের কোন এলাকায় ঘূর্ণিঝড় বেশি হয় ?

ক. নদীর কাছাকাছি　　খ. পুকুরের কাছাকাছি

গ. বড় খালের কাছাকাছি　　ঘ. সমুদ্রের কাছাকাছি

১.৪ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কতবার ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছে ?

ক. চার　　খ. দুই

গ. তিন　　ঘ. এক

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. দুর্যোগের সময় আমরা ———————— থাকার চেষ্টা করব।

খ. বন্যা আমাদের সমাজের জন্য ————————।

গ. জলোচ্ছ্বাস ———————— ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে।

ঘ. বাংলাদেশে প্রধানত ———————— সময়ে বেশি আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. বর্ষা মৌসুমের আগে	উঁচু জায়গায় চলে যাব
খ. মানুষের অসাবধানতা অনেক সময়	ভয় না পেয়ে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করব
	সতর্কবাণী প্রচার হয়
গ. বন্যা হলে আমরা	নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়
ঘ. আগুন লাগলে আমরা	দুর্যোগ নিয়ে আসে

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. বাংলাদেশের প্রধান দুর্যোগগুলোর নাম লিখ।

খ. বন্যার সময় কীভাবে পড়ালেখার ক্ষতি হয় ?

গ. ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় কীভাবে মানুষকে সতর্ক করা হয় ?

ঘ. কীভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায় সেগুলো লিখ।

ঙ. ধর্মীয় উৎসবে আমরা বন্ধুদের সাথে কীভাবে আনন্দ করি ?

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি, নারী-পুরুষের হার সম্পর্কে জেনেছি। আরও জেনেছি জনসংখ্যা বেশি হলে পরিবার আর পরিবেশের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে। এবার আমরা জানব বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও হারের পার্থক্য। নিচের ছকে আমরা ১৯৭৪ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা দেখতে পাচ্ছি।

সাল	মোট জনসংখ্যা
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
১৯৯১	১১ কোটি ১৪ লক্ষ
২০০১	১২ কোটি ৯৩ লক্ষ
২০১১	১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ

ছক অনুযায়ী লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৩৭ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা অধ্যুষিত স্থান

জনসংখ্যার ঘনত্ব

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি। একটি দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে যতজন লোক বাস করে তাকেই বলে জনসংখ্যার ঘনত্ব। আমরা আগেই জেনেছি বাংলাদেশের আয়তন হচ্ছে ১,৪৭,৫৭০ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর) বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৬৪ জন মানুষ বাস করে। এখানে প্রতি বছরে ১ দশমিক ৩৪ ভাগ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব আমাদের প্রতিবেশী কয়েকটি দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ :

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নানা কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো

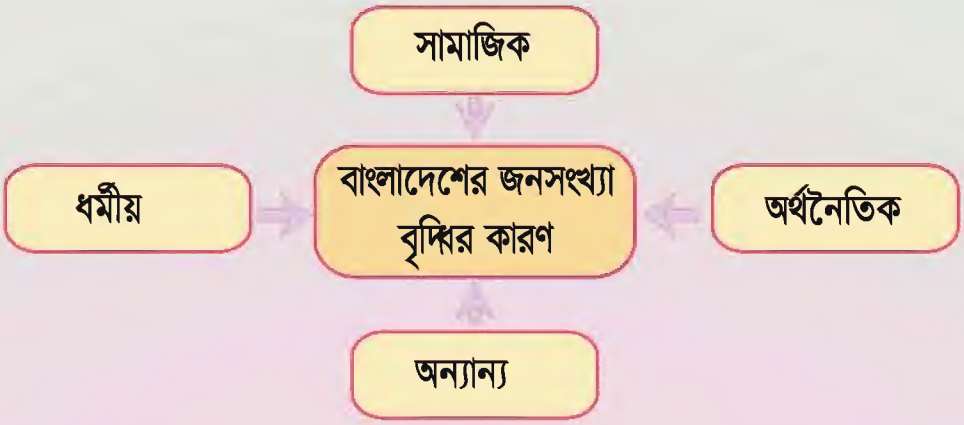

সামাজিক কারণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ রয়েছে। যেমন–শিক্ষার অভাব,বাল্য বিবাহ,বহু বিবাহ,কুসংস্কার, ছেলে সন্তান লাভের আশা ইত্যাদি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। আর তাদের অধিকাংশই আয়-মূলক কাজে জড়িত নয়। ফলে ছেলেমেয়ে লালন পালনেই তাদের বেশি সময় ব্যয় করতে হয়।

অর্থনৈতিক কারণ

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। আর কৃষিকাজে লোকবল বেশি প্রয়োজন হয়। আবার বৃদ্ধ বয়সে সন্তান বিশেষ করে ছেলে সন্তানের উপর মা-বাবা নির্ভর করে। কারণ ছেলেরাই পরিবারের জন্য আয় করে থাকে। আর মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তারা মা-

বাবার সাথে থাকতে পারে না। ফলে বৃদ্ধ বয়সের কথা চিন্তা করে সবাই ছেলে সন্তান চায় আর পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরিবারে অভাবের কারণে গ্রাম ও শহরে অনেক শিশুই মা-বাবার সাথে কাজে যোগ দেয়।

গ্রামে মা-বাবার সাথে কাজে নিয়োজিত শিশু

শহরে হোটেলে নোংরা পরিবেশে কর্মরত শিশু

শহরে মা-বাবার সাথে ইট ভাঙার কাজে নিয়োজিত শিশু

ধর্মীয় কারণ

ধর্মীয় কারণে অনেক মানুষই বিশ্বাস করেন সৃষ্টিকর্তা যেহেতু আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাই সবার খাবার ব্যবস্থাও তিনি করবেন। আর সে কারণে তারা অধিক সন্তান জন্ম দেবার খারাপ দিক সম্পর্কে কখনও ভাবেন না। এর ফলে পরিবারে ও দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য

উপরের সবগুলো কারণের মতো অন্যান্য কারণগুলো প্রায় একইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। যেমন– প্রাকৃতিক ও জৈবিক কারণে উচ্চ জন্মহার ও নিম্ন মৃত্যুহার। জনসংখ্যা সম্পর্কে সরকারের পরিকল্পনা ও নীতিমালার বারবার পরিবর্তন, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাব ইত্যাদি।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশে নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সবাই পড়ালেখা করতে পারছে না। অসুখ হলে সবাই ডাক্তারের কাছে যেতে পারছে না। এছাড়া জনসংখ্যা বেশি হবার কারণে সবাই চাকরি পাচ্ছে না। গ্রামে ও শহরে অপরাধ বেশি হচ্ছে। সবাই ঠিকমতো ও পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছে না। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে হবে। আর এজন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এভাবেই আমরা সকলের জন্য একটি সুন্দর সমাজ গড়তে পারি।

আবার পড়ি

১. বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি।

২. বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি।

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন– সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও অনান্য কারণ।

পরিকল্পিত কাজ

১. বিভিন্ন বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক গ্রাফ বা চার্ট তৈরি করা।

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কিত চিত্র বা ভিডিও চিত্র দেখানো।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ ২০১১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ?

ক. ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ খ. ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ

গ. ১১ কোটি ১৪ লক্ষ ঘ. ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ

১.২ বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন মানুষ বাস করে ?

ক. ৮৬৪ জন খ. ৯৬৩ জন

গ. ৯৬৪ জন ঘ. ৯৬৫ জন

১.৩ বাংলাদেশের অর্থনীতি কীসের উপর নির্ভরশীল ?

ক. কৃষি খ. শিল্প

গ. চাকরি ঘ. ব্যবসা

১.৪ বাংলাদেশে প্রতিবছর কত ভাগ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ?

ক. ১.৩২ ভাগ খ. ১.৩৩ ভাগ

গ. ১.২৪ ভাগ ঘ. ১.৩৪ ভাগ

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. একটি দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে যতজন লোক বাস করে তাকেই বলে ———।

খ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৩৭ বছরের মধ্যে প্রায় ——————— হয়ে গেছে ।

গ. অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ———————হচ্ছে।

ঘ. বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ————— নারী।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. বাংলাদেশের আয়তন	বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে
খ. বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব	আয়মূলক কাজে জড়িত নয়
গ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা	১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার
ঘ. বাংলাদেশের নারীদের অধিকাংশই	খুব কম
	খুব বেশি

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো কী ?

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কী কী সমস্যা হচ্ছে ?

গ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কেমন ?

ঘ. জনসংখ্যার ঘনত্ব কাকে বলে ?

ঙ. জনসংখ্যা কমানোর জন্য কী কী করা যেতে পারে ?

দ্বাদশ অধ্যায়

এশিয়া মহাদেশ

অবস্থান

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এটি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকা জুড়ে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত। এটি কেবল আয়তনে নয়, জনসংখ্যার দিক থেকেও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ। পৃথিবীর প্রায় ৬০ ভাগ লোক এ মহাদেশে বাস করে। নিচে বিশ্বের মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান লক্ষ করি।

বিশ্ব মানচিত্রে এশিয়া

এশিয়ার উত্তরে উত্তর মহাসাগর। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে ইউরোপ মহাদেশ ও ভূমধ্যসাগর। এশিয়ার দক্ষিণে পূর্বদিকে বাংলাদেশের অবস্থান।

উল্লেখযোগ্য দেশ

এশিয়া মহাদেশে মোট ৪৭টি দেশ আছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ হলো বাংলাদেশ, চীন, ভারত, জাপান, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত ইত্যাদি।

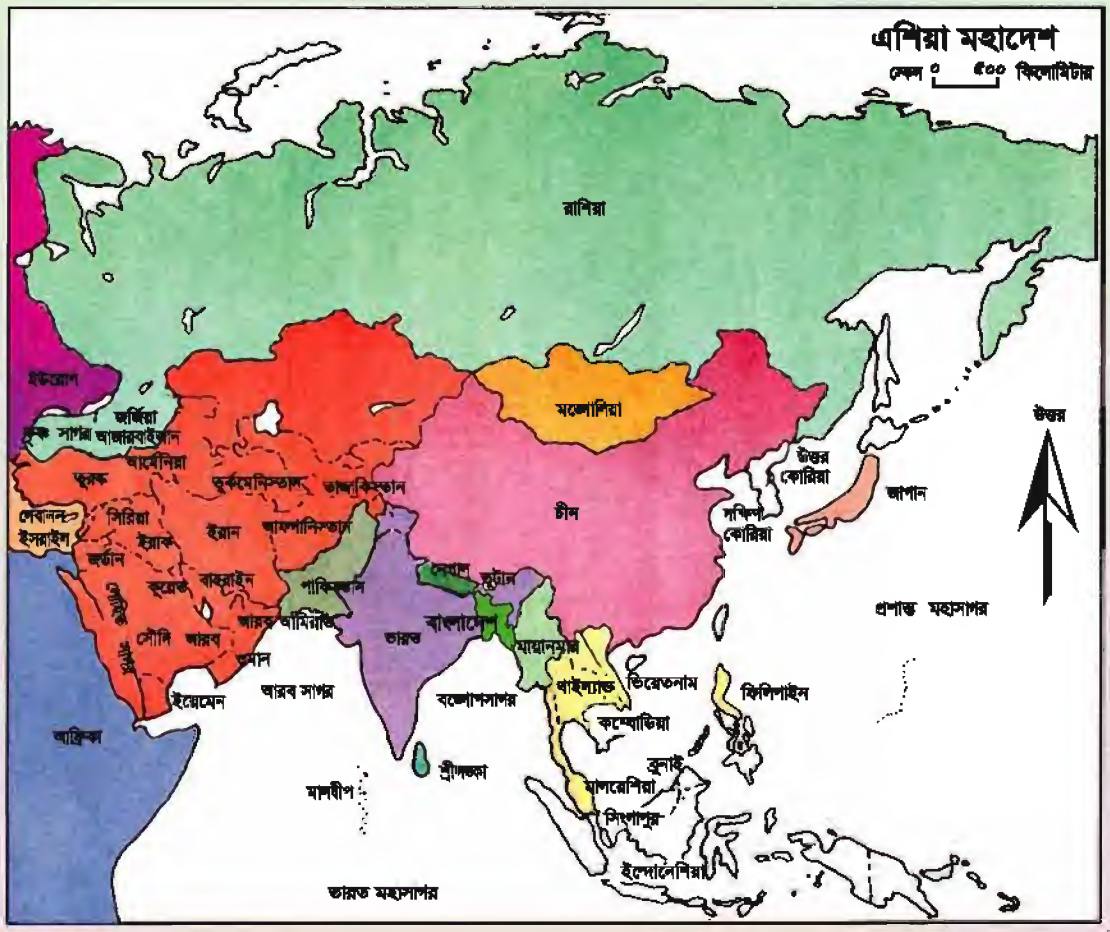

এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান

কাজ: মানচিত্র অথবা ভূগোলক এর মাধ্যমে দেশগুলোর অবস্থান দেখে এবং এশিয়া মহাদেশের আরও দশটি দেশের তালিকা তৈরি কর।

জলবায়ু

এশিয়া একটি বিশাল মহাদেশ। তাই এর বিভিন্ন অংশের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের। যেমন– ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায় সারা বছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়।

বাংলাদেশ ও আশেপাশের দেশগুলোতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে অনেক বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকালে বৃষ্টি প্রায় হয়ই না। এশিয়ার মাঝখানে আছে মরুভূমি। মরুভূমিতে আবহাওয়া খুব গরম এবং বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। কোনো কোনো অঞ্চলে (ইরান, ইরাক, জর্ডান, ইসরাইল প্রভৃতি দেশ) শীতকালে বৃষ্টি হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না। এশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়া অবস্থিত। সাইবেরিয়া ও এর আশেপাশের এলাকা খুব ঠান্ডা। তীব্র শীতের কারণে সেখানে কোথাও কোথাও তুষারপাত হয়।

নদী

এশিয়ায় অনেক বড় বড় নদী আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, চীনের মেকং, হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং, পাকিস্তানের সিন্ধু, ভারতের গঙ্গা, মধ্যপ্রাচ্যের টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস উল্লেখযোগ্য। চীনের ইয়াংসিকিয়াং এশিয়ার দীর্ঘতম নদী।

প্রাণী

এশিয়ার বনভূমিগুলোতে বাঘ, হাতি, হরিণ, বানর, বিভিন্ন ধরনের সাপ ও অন্যান্য প্রাণী পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত।

ফসল

এশিয়ার উৎপাদিত ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) খাদ্যশস্য ও (খ) অর্থকরী ফসল।

খাদ্যশস্য

এশিয়ায় উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল, মসল্লা ইত্যাদি প্রধান। ধান ও গম উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। এশিয়ার অধিকাংশ স্থানেই ধান ও গম উৎপাদন হয়। এছাড়াও প্রচুর ভুট্টা ও মসল্লা হয়। মসল্লা উৎপাদনের জন্য এশিয়া মহাদেশ বিখ্যাত। সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলোতে অনেক নারিকেল জন্মে।

অর্থকরী ফসল

এশিয়ার প্রধান অর্থকরী ফসলগুলো হলো পাট, তুলা, রবার, চা, তামাক ইত্যাদি। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে কফি, আখ ও রেশম জন্মে।

খনিজদ্রব্য

এশিয়া মহাদেশে প্রচুর খনিজদ্রব্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। এছাড়াও তামা, সোনা, রুপা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

শিল্প

শিল্পে এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট উন্নত। এ মহাদেশের জাপান, চীন, ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অনেক শিল্প আছে। এশিয়ার শিল্পগুলোর মধ্যে লোহা ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্রশিল্প, পশম শিল্প, কাগজ ও পাট শিল্প উল্লেখযোগ্য।

আবার পড়ি

১. আয়তনে এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ।
২. বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত।
৩. এখানে ৪৭টি দেশ আছে।
৪. এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের।
৫. এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, ফসল ও খনিজ পদার্থ রয়েছে।
৬. শিল্পক্ষেত্রেও এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট উন্নত।

পরিকল্পিত কাজ

১. দলগতভাবে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর চার্ট তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করা।
২. শিক্ষার্থীদের নিয়ে মানচিত্র / ভূগোলক থেকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ খুঁজে বের করার ক্যুইজ আয়োজন করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি ?

ক. আমেরিকা খ. ইউরোপ
গ. এশিয়া ঘ. আফ্রিকা

১.২ এশিয়ার কোন দেশে সারাবছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয় ?

ক. বাংলাদেশ খ. মালয়েশিয়া
গ. ভারত ঘ. পাকিস্তান

১.৩ হোয়াংহো নদী এশিয়ার কোন দেশে অবস্থিত ?

ক. জাপান খ. উত্তর কোরিয়া

গ. ইন্দোনেশিয়া ঘ. চীন

১.৪ কোনটি উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ?

ক. ধান খ. তুলা

গ. কফি ঘ. রবার

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের ———————— অবস্থিত ।

খ. এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের আবহাওয়া খুব ———————— ।

গ. ইয়াংসিকিয়াং এশিয়ার ———————— নদী।

ঘ. বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের ———————— অবস্থিত।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. এশিয়ার উত্তরে	ইউরোপ
খ. এশিয়ার দক্ষিণে	উত্তর মহাসাগর
গ. এশিয়ার পূর্বে	ভারত মহাসাগর
ঘ. এশিয়ার পশ্চিমে	প্রশান্ত মহাসাগর
	অস্ট্রেলিয়া

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. এশিয়া মহাদেশের অবস্থান লিখ।

খ. কোন কোন দিক দিয়ে এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এবং কেন ?

গ. এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু কী ধরনের ?

ঘ. এশিয়ায় উৎপাদিত ফসলের বর্ণনা দাও।

ঙ. এশিয়া মহাদেশের খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। এ বছরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ যুদ্ধ করে। যুদ্ধ করে পাকিস্তানের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আজকের এই বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডটি ছিল পাকিস্তানের অধীনে। পাকিস্তান দেশটি ছিল দুটি অংশে বিভক্ত– পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান শুরুতে পূর্ববাংলা নামে পরিচিত ছিল। কারণ এখানে বাস করত বাঙালিরা। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রায় সবাই ছিল অবাঙালি। তখনকার পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানই আজকের বাংলাদেশ। পাকিস্তান দেশটির রাজধানী ছিল তখন পশ্চিম পাকিস্তানে। শাসন ক্ষমতাও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের হাতে। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানিরাই শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই বেশি সুযোগ সুবিধা পেত। শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের নানাভাবে শোষণ ও নির্যাতন করত। তারা পূর্ব বাংলার সম্পদ লুটপাট করত। তারা বাঙালি জাতিকে সম্মান করত না। এমন কি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার পর্যন্ত দিতে চায় নি।

বাঙালিরা এসব শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। আমরা জানি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় এক মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। ফলে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ আরও অনেকে শহিদ হন। ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকায় তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা শহিদ দিবস পালন করি। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আমাদের স্বাধীকার আন্দোলনের সূচনা হয়।এই জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি সেই সরকার ভেঙ্গে দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালির মুক্তির দাবী ৬-দফা পেশ করেন। ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা দাবী করায় বঙ্গবন্ধুসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দেওয়া হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ তাঁদেরকে কারাগারে বন্দী করা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ সকল কারাবন্দীকে মুক্ত করার জন্য ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করে এবং তা এক সময় গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। যা ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান নামে খ্যাত। এই আন্দোলন চলাকালীন ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা মামলায় বন্দী সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং পুলিশের গুলিতে নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ এবং নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর।

৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের ছবি

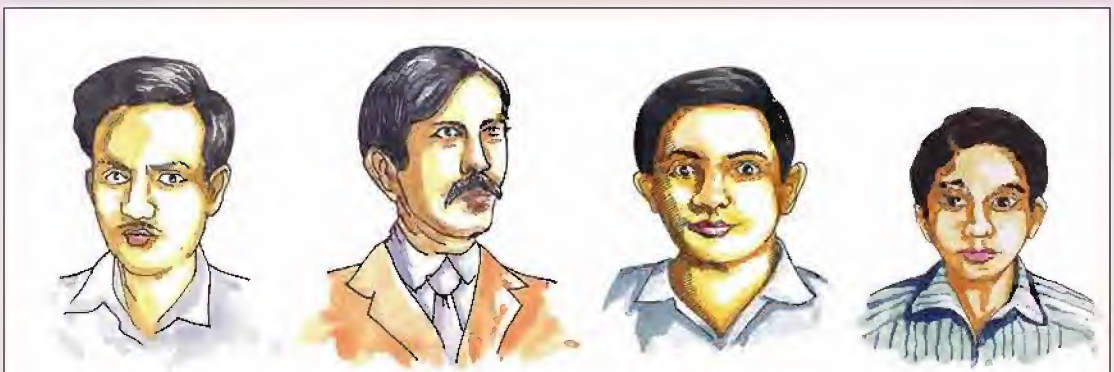

শহিদ আসাদ | শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক | শহিদ ড. শামসুজ্জোহা | শহিদ মতিউর

এর ফলে আন্দোলন আরও জোরদার হয়। এই আন্দোলনের চাপেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট স্বৈরশাসক আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা লাভ করেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেন নি। এ ঘটনায় পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সারাদেশে বিক্ষোভ ও হরতাল চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। বঙ্গবন্ধু বলেন,“. . . এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের ছবি

এ ডাকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ একযোগে সাড়া দেয়। ১৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে ইয়াহিয়া খান ও তার সরকারের আলোচনা চলে। কিন্তু শেষাবধি সব আলোচনা ব্যর্থ হয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর ও সাধারণ নারীপুরুষকে হত্যা করে। এ কারণেই ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালোরাত হিসেবে পরিচিত। সে রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের আগে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর ভিত্তিতে ২৬শে মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। পরদিন ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাটের স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

২৫শে মার্চ কালোরাতের ছবি

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ চলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে ১০ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। এই সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এই সরকারের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। বাঙালিদের পাশাপাশি এদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ

তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের সাহায্য করে। এরা রাজাকার, আল বদর নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে এদেশের প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এক কোটি মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে পাশের দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। এত ত্যাগ ও সাহসের বিনিময়ে আমরা শেষ পর্যন্ত ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় অর্জন করি। বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। আমরা পাই একটা নতুন মানচিত্র। সেই সাথে লাভ করি আমাদের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত।

আবার পড়ি

১. পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য ১৯৭১ সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম।

২. ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন।

৩. ১৯৭০ এর ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নেতৃত্বাধীন দল বিপুল ভোটে জয়ী হয়। কিন্তু তাঁদেরকে সরকার গঠন করতে দেয় নি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী।

৪. ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় স্বাধীনতার ডাক দেন।

৫. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙালিদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ।

পরিকল্পিত কাজ

১. নিজ এলাকার একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ক্লাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর কাছে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঘটনাবলি শোনা।

২. ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনায় শহিদদের ছবি সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম বানানো। ছবিগুলোর নিচে ক্যাপশন দেওয়া।

৩. সম্ভব হলে এলাকার কোনো শহিদ পরিবারের সাথে কথা বলে তাঁর সম্পর্কে জানা ও ক্লাসে তা বলা।

৪. শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আয়োজিত শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ কোন সালে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল ?

ক. ১৯৪৭ সাল খ. ১৯৫০ সাল

গ. ১৯৫২ সাল ঘ. ১৯৫৪ সাল

১.২ কে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ হন ?

ক. রফিক খ. জব্বার

গ. সালাম ঘ. আসাদ

১.৩ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল কোন দল ?

ক. আওয়ামী লীগ খ. মুসলিম লীগ

গ. ন্যাপ ঘ. পাকিস্তান পিপলস পার্টি

১.৪ বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণ কোথায় দিয়েছিলেন ?

ক. রমনা পার্কে খ. রেসকোর্স ময়দানে

গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ. লাহোরে

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ———— দাবি ঘোষণা করে।

খ. ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ হন স্কুল ছাত্র মতিউর, শ্রমিক রুস্তম, সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ————।

গ. ১৯৭০ সালের ———— মাসে গোটা পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ. ———— নির্দেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক.সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবি ঘোষিত হয়েছিল	একজন স্কুল ছাত্র ছিলেন
খ."... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এটি কার ভাষণ ছিল?	১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে
গ. ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ মতিউর	২৫শে মার্চ
ঘ.বাংলাদেশের ইতিহাসে 'কালোরাত' হিসাবে পরিচিত	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
	শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে লিখ।

খ. ১৯৭০ এর নির্বাচনে কোন দল জয়ী হয় ?

গ. ১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফল কী ছিল ?

ঘ. ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ কী কারণে বিখ্যাত ?

ঙ. ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চের রাতে কী ঘটেছিল ?

চর্তুদশ অধ্যায়

আমাদের ইতিহাস

অনেক অনেক বছর আগে আমাদের এই দেশটা কেমন ছিল তা খুব জানতে ইচ্ছে করে। চোখ বন্ধ করে যদি দেখ অনেক আগে কেমন ছিল আমাদের এই দেশ, কেমন ছিল সে সময়ের মানুষের জীবন। নিশ্চয়ই নানা কথা মনে হচ্ছে। চলো আমরা পড়ে জানি।

প্রাচীন যুগ

আমরা রাজা-রানির গল্প প্রায়ই শুনি। প্রাচীনকালে আমাদের এই অঞ্চলেও বেশ কিছু বড় বড় রাজা ও তাঁদের রাজত্ব ছিল। প্রাচীনকালের এসব শাসকরা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন।

এদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য রাজার নাম জানি:

১. রাজা শশাংক

২. রাজা গোপাল

৩. রাজা লক্ষণ সেন

প্রাচীন বাংলার রাজা

রাজা শশাংক

শশাংক ছিলেন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজা। কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব তিনি বাংলার বাইরে উত্তর ভারতে রাজ্যসীমানা বাড়ানোর চেষ্টা করেন এবং কিছুটা সফলতাও লাভ করেছিলেন। তাছাড়া বাইরের শত্রুর আক্রমণের মুখেও তিনি বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন।

রাজা গোপাল

রাজা গোপাল ছিলেন পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় ৪০০ বছর এই রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করেছিল। গোপালের সিংহাসন লাভের আগে প্রায় একশ বছর ধরে বাংলায় ভীষণ এক অস্থির অবস্থা চলছিল। ছোটখাট রাজ্যগুলো কলহ ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। কোনো

একক বা স্থায়ী শাসন ছিল না । জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এই অরাজকতার কারণে। গোপালের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, মনে করা হয় স্থানীয় নেতাদের সহযোগিতায় তিনি এই অরাজকতা ঘুচিয়ে রাজা পদে অধিষ্ঠিত হন ।

রাজা লক্ষণ সেন

সেন রাজবংশের রাজা লক্ষণ সেন ছিলেন প্রাচীন বাংলার শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। পাল রাজাদের পরে সেন রাজারা ক্ষমতায় এসেছিলেন। এদের সময়ই সর্বপ্রথম পুরো বাংলা জুড়ে একক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লক্ষণ সেন ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ও কবি। তাঁর রাজসভায় অনেক বিখ্যাত কবি ছিলেন। লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেছিলেন।

সামাজিক জীবন

প্রাচীনকালের সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামের জীবন ছিল সহজ ও সরল। গ্রামে কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা, মুচি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করত। সে সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ এ দুটিই ছিল প্রধান ধর্ম। কাজেই অধিকাংশ মানুষ ছিল প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। মানুষের বেশভূষায় জাঁকজমক ছিল না। মেয়েরা শাড়ি পরতো। আর ছেলেরা পরতো ধুতি। নৌকা, গরুর গাড়ি ও পালকি ছিল প্রধান যানবাহন। প্রাচীনকাল থেকেই ভাত ছিল বাঙালির প্রধান খাদ্য। সাথে শাক সবজি, ডাল, মাছ ইত্যাদিও খাওয়া হতো। বিনোদনের প্রধান উপাদান ছিল গান, বাজনা, নাচ, পাশা, দাবা, মল্লযুদ্ধ ও কুস্তি খেলা।

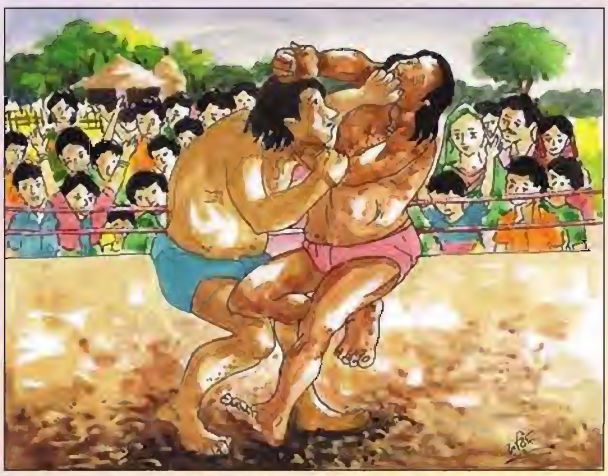

কুস্তি লড়াই

গ্রামের সাধারণ নারী ও পুরুষ

অর্থনৈতিক জীবন

কৃষিকাজই ছিল প্রাচীন বাংলার মানুষের প্রধান পেশা। বাংলার উর্বর মাটি ও জলবায়ু দুটিই ছিল কৃষি উপযোগী। সহজেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। ধান ছিল প্রধান ফসল। পাশাপাশি প্রচুর আখও উৎপাদন করা হতো। আখের তৈরি গুড় ও চিনির জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল। তাছাড়া ডাল, যব, তুলা, সরিষা, পান ইত্যাদির চাষও করা হতো। লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হতো। সে সময় নদী ও খালবিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত।

কৃষির পাশাপাশি কুটির শিল্পেরও প্রচলন ছিল সে সময়। তুলা ও রেশম দিয়ে বাংলার কারিগররা নানা রকম কাপড় বুনত। এসব কাপড় বিদেশেও রপ্তানি হতো। প্রাচীন বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে বণিকরা আসত বাণিজ্য করতে। আবার বাংলার বণিকরাও সমুদ্রপথে বিদেশের সাথে বাণিজ্য করত। ফলে বাংলার নানা স্থানে বন্দর গড়ে ওঠে। চট্টগ্রাম বন্দর তখন থেকেই বিখ্যাত ছিল।

সমুদ্র পথে বাণিজ্য যাত্রা

মধ্যযুগ

তুর্কী সৈনিক বখতিয়ার খিলজী রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে প্রথম বাংলার সিংহাসন দখল করেন ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে । তাঁর মাধ্যমেই বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এসময় থেকে বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগের শুরু বলে ধরা হয়। মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দিল্লির শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলার শাসকদের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা।

মধ্যযুগের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাসকরা হলেন–

১. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

২. বার ভূঁইয়া

৩. শায়েস্তা খান

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রথম মুসলিম শাসক যিনি সমগ্র বাংলাকে তাঁর শাসনাধীনে এনেছিলেন। তিনি দিল্লির সুলতানদের থেকে বাংলার স্বাধীনতা বজায় রাখেন ও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'বাঙ্গালাহ' নামটি তাঁর সময় থেকেই শুরু হয়। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সূচনা করেন। এ সময় দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, পণ্ডিত ও কবিদের সমাদর বাড়ে।

ঈসা খান

বারো ভূঁইয়া

দিল্লির সম্রাট আকবরের সময় বাংলায় মোগল শাসনের সূচনা হয়। কিন্তু বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলের বড় বড় জমিদাররা এ শাসন মেনে নিতে চান নি। তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে জমিদারী চালাতে থাকেন। তাঁদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল। এরাই বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত। এদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁও এর জমিদার ঈসা খান। অন্যান্য বার ভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন মুসা খান, ফতেহ খান, কেদার রায়, চাঁদ রায় প্রমুখ। শক্তিশালী মোগল সম্রাটদের বারবার আক্রমনের মুখে ঈসা খান ও অন্যান্য বারো ভূঁইয়াদের বীরত্ব তাঁদেরকে বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে।

শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খান প্রথমে ছিলেন বাংলায় নিযুক্ত দিল্লির মোগল সম্রাটদের একজন সুবাদার। তাঁর আমল

সুশাসনের জন্য বিখ্যাত। এসময় জিনিসপত্রের দাম খুব সস্তা ছিল। টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এছাড়া তিনি জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন।

সামাজিক অবস্থা

মধ্যযুগে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা মিলেমিশে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করত। কৃষক ছাড়াও তাঁতি, কারিগর, ছুতার, রাজমিস্ত্রি, মজুর ইত্যাদি নানা পেশার লোক সমাজে বাস করত। হিন্দু পুরুষরা ধুতি, চাদর এবং পায়ে খড়ম পরতেন। নারীরা পরতেন শাড়ি। অন্যদিকে ধনী মুসলমান পুরুষরা পায়জামা, পাগড়ি, জুতা এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষরা ধুতি, লুঙ্গি পরতেন। সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান নারীরা প্রধানত শাড়ি পরতেন। আগের মতোই ভাত, মাছ, সবজি, ডাল ইত্যাদি ছিল বাঙালির প্রধান প্রধান খাবার। মধ্যযুগে শাসকদের আনুকূল্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়। এযুগে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি ইসলামধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। সমাজে সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বাস করত। ফলে বাংলার একটা মিলিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

এ যুগেও অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। ধান, পাট, গম, যব, মরিচ, মসলা, আখ, নারিকেল, নানা রকম রবিশষ্য ও শাকসবজি উৎপাদিত হতো। বাংলার তুলা খুবই বিখ্যাত ছিল। এই তুলা থেকে তৈরি সুতা দিয়ে এসময় রকমারি মসলিন কাপড় বানানো হতো।
কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প ছাড়াও নৌকা, জাহাজ, গালিচা, কাগজ ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠেছিল এসময়। হাতির দাঁতের শিল্প ও কাঠের কাজে বাংলার শিল্পীরা পারদর্শী ছিলেন।
এ যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। রপ্তানি বাণিজ্য এসময় বেশি ছিল। বাংলার বণিকেরা রেশম, বিলাস সামগ্রী, তুলা ও নানাবিধ মূল্যবান পাথর আমদানি করতেন। আর বাংলা থেকে রপ্তানি হতো চাল, চিনি, আদা, হলুদ, মসলিন ও অন্যান্য ধরনের কাপড়। বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম এসময় সুপরিচিত ছিল।

আবার পড়ি

১. প্রাচীন যুগের উল্লেখযোগ্য রাজারা হলেন: শশাংক, গোপাল ও লক্ষণ সেন।
২. প্রাচীন যুগে সহজ, সরল গ্রামীণ জীবনে বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করতেন। প্রধান ধর্ম ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ।
৩. প্রাচীন যুগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পাশাপাশি কুটির শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল।

৪. বখতিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে। মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য শাসকরা হলেন: ইলিয়াস শাহ, বারো ভূঁইয়া, শায়েস্তা খান।
৫. সমাজে হিন্দু, বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি ইসলামধর্মের বিস্তার ঘটে ও মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ে। এদের মিলেমিশে থাকার ফলে সমাজে একটা মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।
৬. কৃষিকাজের পাশাপাশি ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষত রপ্তানি বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে।

পরিকল্পিত কাজ

১. প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজাদের ন্যায় ভূমিকা অভিনয় করা।
২. প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের তুলনামূলক চার্ট তৈরি করা।

	প্রাচীন যুগ	মধ্যযুগ
খাদ্য		
পোশাক		
ফসল		
ব্যবসায়-বাণিজ্য		

৩. প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের পছন্দনীয় কোনো একজন শাসককে বেছে নিয়ে তাঁকে কেন্দ্র করে একটি গল্প লেখা। গল্পের একটি শুরু, বর্ণনা ও শেষ থাকবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ প্রাচীন যুগের শাসক কে ?

ক. বখতিয়ার খিলজী খ. ঈসা খান
গ. ইলিয়াস শাহ ঘ. গোপাল

১.২ বারো ভূঁইয়ারা কোন যুগের ?

ক. মধ্যযুগ খ. প্রাচীন যুগ

গ. আধুনিক যুগ ঘ. কোনটাই না

১.৩ মধ্যযুগে কোন ধর্মের বিস্তার ঘটে ?

ক. হিন্দু খ. ইসলাম

গ. বৌদ্ধ ঘ. খ্রিষ্টান

১.৪ সেন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ?

ক. গোপাল খ. লক্ষণ সেন

গ. শশাংক ঘ. কেদার রায়

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. শশাংক ছিলেন বাংলার ———————— গুরুত্বপূর্ণ রাজা।

খ. বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ———————— ।

গ. প্রাচীনকালের সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ———————— ।

ঘ. বাংলার একটা ———————— সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে ।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. বারো ভূঁইয়াদের নেতা	শায়েস্তা খানের সময়
খ. বাংলায় ১০০ বছর ধরে চলা অস্থির, অরাজক অবস্থার অবসান করে ক্ষমতায় আসেন	রাজা গোপাল
গ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময়	ঈসা খান
ঘ. টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত	সমগ্র বাংলা এক হয়
	বাংলা বিভাজিত হয়

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. বারো ভূঁইয়া কারা এবং কী করেছিলেন ?

খ. প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল ?

গ. মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক জীবন সম্পর্কে লিখ।

গ. শায়েস্তা খানের শাসন কেন বিখ্যাত ছিল ?

ঘ. শশাংক কে ছিলেন এবং কী করেছিলেন ?

পঞ্চদশ অধ্যায়

আমাদের সংস্কৃতি

সংস্কৃতি

সহজ কথায় সাধারণভাবে আমরা যা কিছু করি এবং যেভাবে করি তাই আমাদের সংস্কৃতি। আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি। সে অর্থে জীবনের সকল কিছুই সংস্কৃতির অংশ। আমাদের জীবনযাপনের ধরন, পোশাক, খাদ্য, উৎসব, অনুষ্ঠান, ভাষা, গানবাজনা, বাড়িঘর, শিল্পসাহিত্য, অলংকার, যানবাহন, তৈজসপত্র, বিশ্বাস সব নিয়েই আমাদের সংস্কৃতি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এসবের পরিবর্তন ঘটতে পারে। ফলে সংস্কৃতির ধরনও বদলায়। কাজেই সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। তবে এর সবটাই বদলে যায় তা নয়। সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রধান দিক দীর্ঘ সময় অপরিবর্তনশীল থেকে যায়।

বাংলাদেশ যেহেতু নানা ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষের দেশ, তাই এদের প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি। সবটা মিলিয়েই আমরা আর আমাদের এই দেশ।

এখন আমরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব, যা ধর্ম ও গোষ্ঠী ভেদে সকলেই কমবেশি অনুসরণ করে থাকি।

ভাষা

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ভাষা। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বাঙালি। তাই বাংলা আমাদের প্রধান ভাষা। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ভেদে সব বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা । তবে বাঙালি ছাড়াও এদেশে রয়েছে আরও অনেক অবাঙালি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। এদের নিজস্ব আলাদা আলাদা ভাষা আছে, যা তাদের মাতৃভাষা। আমরা সবাই যে যার মাতৃভাষায় কথা বলি, লেখালেখি ও ভাবনা-চিন্তা করি।

পোশাক-পরিচ্ছদ

মেয়েদের পোশাক : বাঙালি মেয়েদের প্রধান পোশাক শাড়ি। দৈনন্দিন জীবনে, উৎসব-অনুষ্ঠানে মেয়েরা শাড়ি পরে থাকে। তবে, সময়ের সাথে সাথে সালোয়ার-কামিজও মেয়েদের দৈনন্দিন পোশাকে পরিণত হয়েছে। কম বয়সী মেয়েদের মধ্যেই সালোয়ার-কামিজ বেশি পরার চল লক্ষ করা যায়। তবে উৎসব-অনুষ্ঠানে সব বয়সী মেয়েরাই সাধারণত

সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়ে শাড়ি পরিহিতা নারী ফ্রক পরা মেয়ে

শাড়ি পড়ে থাকে। ছোট মেয়েরা এখনো বরাবরের মতো ফ্রক, স্কার্ট ইত্যাদি পরে থাকে। তবে শখ করে বিশেষ অনুষ্ঠানে ছোট মেয়েরা কেউ কেউ কামিজ-সালোয়ার ও শাড়ি পরে থাকে। তাছাড়া, মেয়েরা নানা অলংকার, চুড়ি, টিপ, ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজসজ্জা করে থাকে।

লুঙ্গি পরা পুরুষ পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা পুরুষ প্যান্ট-শার্ট পরা পুরুষ

ছেলেদের পোশাক : গ্রামে ও ঘরে এদেশের পুরুষেরা প্রধানত লুঙ্গি পড়ে থাকে। বাইরে, আনুষ্ঠানিক কাজে, অফিসে, স্কুল-কলেজে যাবার সময় ছেলেরা প্যান্ট-শার্ট পড়ে। তবে

বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে থাকে। একসময় বয়স্ক হিন্দু পুরুষরা ধুতি পরতো। মুসলমান ছেলেরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে টুপি পরে থাকে। ছোট ছেলেরা হাফ প্যান্ট পরে থাকে, তবে এর চল কমে আসছে।

ছবি দেখে বাঙালি নারী-পুরুষের পোশাকের একটি তালিকা করি

	মেয়েদের পোশাক	ছেলেদের পোশাক
১.		
২.		
৩.		

আমাদের খাবার

প্রতিদিনের খাবার

কথায় আছে মাছে-ভাতে বাঙালি। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। ভাতের সাথে আমরা ডাল, মাছ, শাক-সবজি ও কখনো কখনো মাংসও খেয়ে থাকি। শাক-সবজি ঋতু ভেদে নানা রকম হয়ে থাকে। তবে শীতের সময় আলু, কপি, পাতাকপি, মটরশুটি, সিম, বরবটি খুব উপাদেয় খাবার। নানা রকম মশলার ব্যবহার আমাদের রান্নাকে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাদ দিয়েছে।

বিশেষ খাবার

বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ও উৎসবে আমরা পোলাও-মাংস, বিরিয়ানী বা খিচুড়ি খেয়ে থাকি। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খাওয়া বাঙালিদের এক ধরনের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া, গরমের দিনে বিশেষত গ্রামে কৃষক পরিবারে পান্তা ভাত, কাঁচা মরিচ বা বিভিন্ন ধরনের ভর্তা-ভাজি খাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

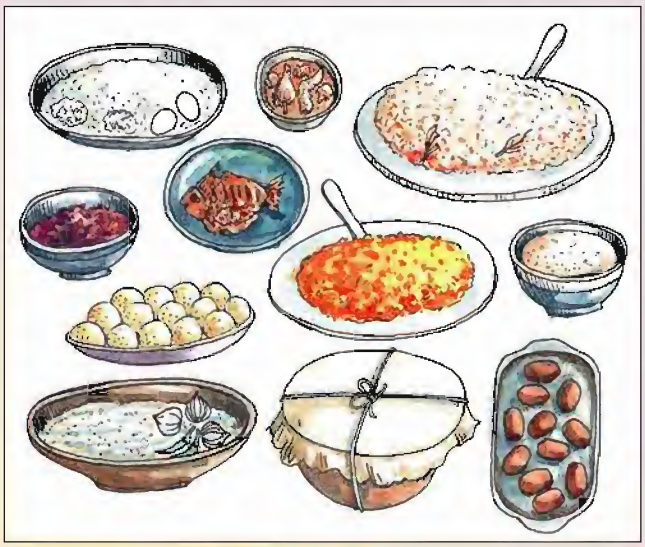

নানা রকম খাবার

মিষ্টি

মিষ্টির দেশ বাংলাদেশ। রকমারি মিষ্টি ও মিষ্টিজাত দ্রব্য আমাদের উৎসব, অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। যে কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান, আনন্দ সংবাদ আমরা সাধারণত মিষ্টি দিয়ে উদ্‌যাপন করে থাকি। আমাদের মিষ্টি খাবার প্রধানত দুধের তৈরি। এর মধ্যে রয়েছে দই, পায়েস, রসগোল্লা, চমচম, ক্ষীর ইত্যাদি। তাছাড়া অনুষ্ঠানভেদে মিষ্টি খাবারের আয়োজনে ভিন্নতা আসে। যেমন– ঈদে মুসলমান মাত্রেই সেমাই রান্না করে থাকেন; শবেবরাতে বরফি। হিন্দুদের পূজা-পার্বণে পায়েস, নাড়ু, মোয়া, মুড়কি; বড়দিনে খ্রিস্টানরা কেক তৈরি করেন।

আচার-অনুষ্ঠান

নানা আচার-অনুষ্ঠানে ভরপুর আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন। মুখেভাত, আকিকা, মুসলমানি, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, পানচিনি, গৃহপ্রবেশ, হাতেখড়ি, হালখাতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আজ রাজার ছোট বোনের নাম রাখার অনুষ্ঠান: আকিকা। দাদু ওর নাম দিলেন রানি

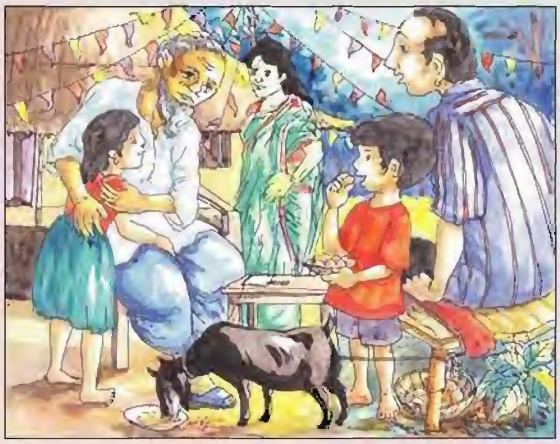

আকিকার অনুষ্ঠান

মুখে ভাতের অনুষ্ঠান

রমার ছোট ভাই রতনের মুখে ভাত আজ। আজ থেকে ও ভাত খেতে শুরু করবে।

৯ বছর বয়স হলো আমার।
আজ আমি পায়েস মুখে দেব।

জন্মদিনের অনুষ্ঠান

কি মজা!
আজ রোজি আপুর গায়ে হলুদ
পরশু আপুর বিয়ে।

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান

লোক সংগীত

আবহমানকাল ধরে বাংলার গ্রাম-গঞ্জ মুখর হয়েছে নানা জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদির সুরে। এগুলোই আমাদের প্রধান লোক গান। মাঠে–প্রান্তরে কৃষক হাল বাইতে বাইতে, নদী ও খালে মাঝি, গ্রাম থেকে গ্রামে বাউল ঘুরতে ঘুরতে গলা ছেড়ে এসব গানের সুর তুলেছেন। গ্রামের মেলায়, অনুষ্ঠানে যাত্রাগান, পালাগান, কবি গান, কীর্তনগান, মুর্শিদিগান ইত্যাদির আসর বসে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের সংস্কৃতির বিশেষত লোক সংস্কৃতির একটা বড় অংশই আজ হারাতে বসেছে। আধুনিক জীবনযাত্রা, নাচ-গান, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব সব মিলিয়ে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অনেক কিছুই আর আগের মতো নেই। আগেই জেনেছি সংস্কৃতি পরিবর্তশীল। তারপরেও আমাদের নিজস্বতা ধরে রাখার জন্য নিজস্ব সংস্কৃতিকে পুরোপুরি বাদ দিলে চলবে না। আমরা যেমন নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষায় সচেষ্ট হবো, তেমনি অপরের সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধা করব। 'দেবে আর নেবে, মেলাবে, মিলিব' তবেই না সুন্দর পৃথিবী গড়বো।

আবার পড়ি

১. আমরা যা করি, যেভাবে করি তাই আমাদের সংস্কৃতি। বাংলাদেশে বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের আলাদা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
২. শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ এদেশের মেয়েদের প্রধান পোশাক। আর লুঙ্গি, পাজামা-পাঞ্জাবি ও শার্ট-প্যান্ট এদেশের ছেলেদের প্রধান পোশাক।
৩. ভাত-মাছ-ডাল ও নানা প্রকার মিষ্টি আমাদের প্রধান দেশীয় খাদ্য।
৪. আকিকা, মুখেভাত, জন্মদিন ইত্যাদি আমাদের কয়েকটি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান।
৫. বাউল, ভাটিয়ালি, জারি-সারি, কবিগান, পালাগান ইত্যাদি আমাদের লোক সংগীতের অংশ।
৬. দেশীয় সংস্কৃতির চর্চায় আমরা যত্নশীল হব।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা দেশীয় পোশাক যে যেমন পারে পড়ে ক্লাসে 'যেমন খুশি তেমন সাজো' অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। এর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা দেশীয় ছেলেদের পোশাক, মেয়েদের পোশাক আর ছোটদের পোশাকের তালিকা তৈরি করবে।
২. মুক্ত হাতে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিহিত মানুষের ছবি আঁকবে অথবা বিভিন্ন ধরনের দেশীয় পোশাক পরিহিত মানুষের ছবি সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করবে।
৩. ক্লাসে বা বিদ্যালয়ে কে কী পড়েছে তা পর্যবেক্ষণ করবে এবং তার তালিকা তৈরি করবে।
৪. শিক্ষার্থীরা নিজের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও পাড়াপড়শিদের বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে যেসব আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে বা দেখেছে তার তালিকাও সম্ভব হলে এক/দুই লাইনের বর্ণনা দেবে।

৫. সম্ভব হলে শিক্ষক ক্লাসে লোকগানের শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানাবেন। লোক সংগীতের নমুনা শোনানোর জন্য। শিক্ষক শিল্পীর সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের গানে অংশ নিতে উৎসাহিত করবেন।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ নিচের কোনটি আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির অংশ নয় ?

ক. পায়েস-রসগোল্লা খ. সালোয়ার-কামিজ

গ. ভাটিয়ালি গান ঘ. হ্যাট

১.২ কোনটি মেয়েদের পোশাক ?

ক. লুঙ্গি খ. প্যান্ট

গ. পাঞ্জাবি ঘ. শাড়ি

১.৩ কোনটি আমাদের দেশীয় খাবার ?

ক. পাউরুটি খ. নুডলস

গ. বার্গার ঘ. খিচুড়ি

১.৪ কোনটি আমাদের লোক সংগীত নয় ?

ক. বাউলগান খ. কীর্তনগান

গ. জারিগান ঘ. পপগান

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. আমরা যা কিছু করি এবং যেভাবে করি তাই আমাদের ———————— ।

খ. মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ———————— বলে।

গ. আমাদের সংস্কৃতির বিশেষত লোক সংস্কৃতির একটা বড় অংশই আজ ———————— বসেছে।

ঘ. জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি আমাদের প্রধান ————।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. বাংলাদেশের সংস্কৃতি	ভাত
খ. আমাদের প্রধান খাদ্য	নাম রাখার অনুষ্ঠান
গ. আকিকায় শিশুদের	হাতে খড়ি
ঘ. শিশুদের পড়ালেখা শুরুর অনুষ্ঠানকে বলা হয়	মিশ্র সংস্কৃতি
	অপরিবর্তনশীল সংস্কৃতি

৪. অল্প কথায় উত্তর দাও।

ক. সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় ?

খ. বাংলাদেশের দুএকটি সাংস্কৃতিক উপাদানের নাম লিখ।

গ. এদেশের ছেলেদের পোশাকের বর্ণনা দাও।

ঘ. এদেশের মেয়েদের পোশাকের বর্ণনা দাও।

ঙ. আমরা প্রধানত কী কী খাই ?

চ. আমাদের একটি বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখ।

ষোড়শ অধ্যায়

আমাদের বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অত্যন্ত সুন্দর দেশ। এখানে আছে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা সবাইকে আকর্ষণ করে। তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনেছি। এই পাঠে আমরা আমাদের দেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং কয়েকটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান সম্পর্কে জানব।

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান সমভূমি। এছাড়া আমাদের দেশে কিছু পাহাড় আছে। আছে অনেক নদনদী। ভূমির অবস্থা এবং গঠনের সময় হিসেবে বাংলাদেশকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

১. পাহাড়ি অঞ্চল
২. পুরাতন পলি গঠিত উঁচু সমভূমি
৩. নবীন পলি গঠিত সমভূমি

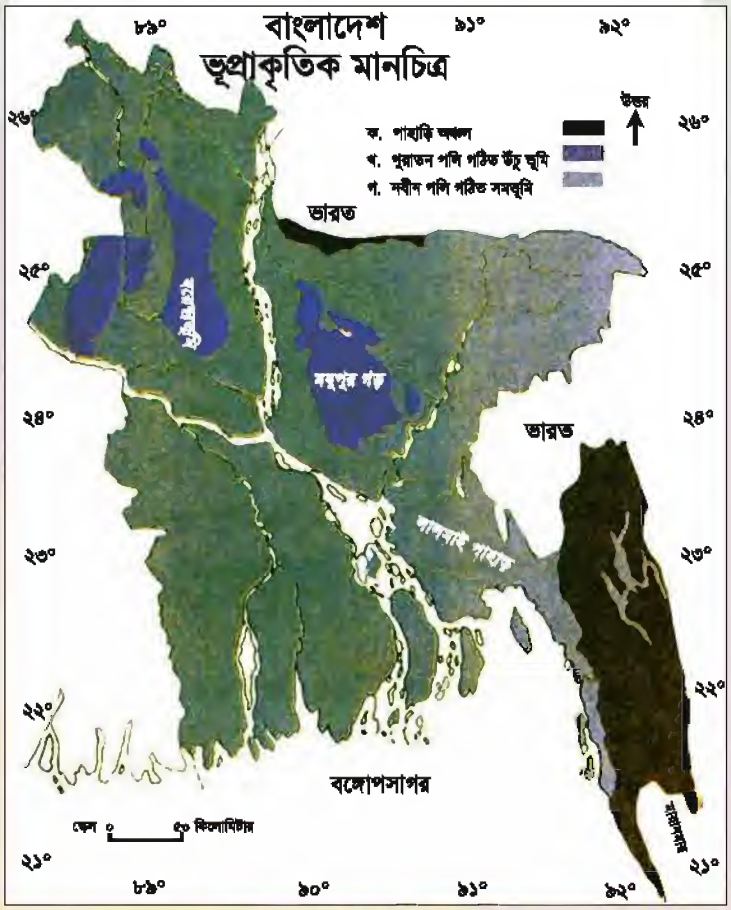

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির মানচিত্র

পাহাড়ি অঞ্চল

আমাদের দেশের বেশিরভাগ স্থান সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। তবে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে কিছু পাহাড় আছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলায়

অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই বাংলাদেশের অধিকাংশ পাহাড় অবস্থিত। এসব পাহাড় টারশিয়ারি যুগে গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম তাজিনডং (বিজয়)। এর উচ্চতা প্রায় ১২৩১ মিটার। দেশের দ্বিতীয় উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম কেওক্রাডং। এর উচ্চতা ১২৩০ মিটার। এ দুটি পাহাড় বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। এই পাহাড়ি এলাকায় বনভূমি আছে।

উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত। এ পাহাড়গুলো বেশি উঁচু নয়। তাই এগুলোকে টিলা বলে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ চা বাগান এসব পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত।

পুরাতন পলি গঠিত উঁচু সমভূমি

বাংলাদেশের কোন কোন এলাকা সমভূমি থেকে কিছুটা উঁচু। এসব উঁচু সমভূমি পুরাতন পলি দিয়ে গঠিত। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলের এই সমভূমিগুলো বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় এ রকম কিছু উঁচু ভূমি আছে। গাজীপুর জেলার উঁচু ভূমিকে ভাওয়ালগড় এবং ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার উঁচু ভূমিকে মধুপুর গড় বলে। এ অঞ্চলে শাল বৃক্ষের বন আছে। কুমিল্লা শহরের দক্ষিণে লালমাই নামে একটি ছোট ও নিচু পাহাড় আছে।

নতুন পলি গঠিত সমভূমি

পাহাড়ি অঞ্চল এবং পুরাতন পলি গঠিত উঁচু সমভূমি ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র এলাকা নতুন পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। এ সমভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে কিছুটা ঢালু। এর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে অসংখ্য নদী। এসব নদীর বয়ে আনা পলিমাটি দিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। ফলে নতুন পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চলের মাটি খুব উর্বর।

বাংলাদেশের জলবায়ু

বাংলাদেশের উপর দিয়ে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আমাদের দেশে তীব্র গরম পড়ে না। আবার তীব্র শীতও আমরা অনুভব করি না। দেশের কোথাও বরফ পড়ে না। বাংলাদেশে যদিও ছয়টি ঋতু আছে কিন্তু তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জলবায়ুকে তিনটি প্রধান ভাগে (গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত) ভাগ করা হয়।

গ্রীষ্মকাল

গ্রীষ্মকাল

মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এ সময় বেশ গরম পড়ে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা সাধারণত ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। তবে কোনো কোনো দিন তাপমাত্রা এর চেয়েও বেশি হয়। এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে। এটি বছরের সবচেয়ে উষ্ণ মাস। এপ্রিল ও মে মাসে ঝড় বৃষ্টি হয়। একে বলে 'কালবৈশাখি'। ঝড়ে প্রচুর ক্ষতি হয়। তবে বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষিকাজের উপকার হয়।

বর্ষাকাল

গ্রীষ্মের পরেই বর্ষা ঋতু শুরু হয়। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষা ঋতু। এসময় দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প নিয়ে মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়। ফলে এ সময় দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এসময় দেশে বছরে গড়ে ২০৩ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়।

শীতকাল

বর্ষা ঋতুর পরে বাংলাদেশে তাপমাত্রা কমতে থাকে। ধীরে ধীরে শীত পড়ে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে শীত ঋতু স্থায়ী হয়। কোনো কোনো বছর বেশি

শীত পড়ে। দেশের উত্তর অঞ্চলে বেশি শীত পড়ে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এটি বাংলাদেশের শীতলতম মাস। এসময় গড় তাপমাত্রা প্রায় ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কখনো তাপমাত্রা এর চেয়ে অনেক কমে যায়। ফলে মানুষের অনেক কষ্ট হয়।

শীতকাল

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ স্থান

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ। এখানে আছে অনেক সুন্দর স্থান যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এখন আমরা দেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুন্দর স্থান সম্পর্কে জানব।

সুন্দরবন

সুন্দরবন বিশ্বের একটি অনন্য সুন্দর প্রাকৃতিক নিদর্শন। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে একে একটি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত দেশের বৃহত্তম বনভূমি। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এখানকার একটি প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরি বৃক্ষ। এজন্য এর নাম হয়েছে সুন্দরবন। এছাড়াও এখানে আছে আরও নানা ধরনের গাছের সমারোহ। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল

সুন্দরবন

টাইগারের আবাসস্থল। এছাড়া আছে গভীর বন, বিভিন্ন ধরনের হরিণ, পাখি, সাপ, কুমির, বনবিড়াল, সজারু, বন্যশূকর ইত্যাদি। এখানকার চিত্রা হরিণ দেখতে খুব সুন্দর। বনের মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়েছে অসংখ্য খাল ও ছোট ছোট নদী। এসব খালে বাস করে কুমির ও আরও অনেক প্রাণী। সুন্দরবনের মাটি খুব উর্বর। এ বন থেকে প্রচুর কাঠ, মধু, মোম ও মাছ পাওয়া যায়। এটি দেশের দক্ষিণ অঞ্চলকে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত

'কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত' পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত। পার্বত্য চট্টগ্রামের কক্সবাজার জেলায় এটি অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেষে এ সমুদ্র সৈকতটি অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এ সৈকতে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে অপূর্ব সুন্দর। এছাড়া আছে সমুদ্রের সুউচ্চ ঢেউ, সৈকতের বালুকণায় শামুকের হেটে বেড়ানো ও সবুজ ঝাউবন। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে আছে আরও কিছু সুন্দর জায়গা। এগুলো হলো : লাবনী সৈকত, হিমছড়ি, ইনানি বিচ। লাবনী বিচই কক্সবাজারের প্রধান সমুদ্রসৈকত। হিমছড়ি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত থেকে ১৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। একপাশে সমুদ্র। হিমছড়ি জলপ্রপাতের জন্য বিখ্যাত। এখানকার আরেকটি আকর্ষণ হলো ক্রিসমাস গাছ। ইনানি বিচ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি সোনালি বালু এবং পরিষ্কার পানির জন্য বিখ্যাত। পরিবার ও আপনজনদের নিয়ে অবসরে ভ্রমণ ও সময় কাটানোর জন্য একটি সুন্দর জায়গা হলো কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত

হিমছড়ির জলপ্রপাত

রাঙামাটি

রাঙামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সদর দপ্তর। এটি কাপ্তাই হ্রদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। রাঙামাটি সবুজ পাহাড়, বন ও লেকে ঘেরা একটি সুন্দর জায়গা ও জনপ্রিয় অবকাশ কেন্দ্র। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও প্রাণী আছে। রাঙামাটিতে চাকমা, মারমা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাসস্থান। এখানে একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জাদুঘর আছে। আরও

রাঙামাটির পাহাড় ও লেক

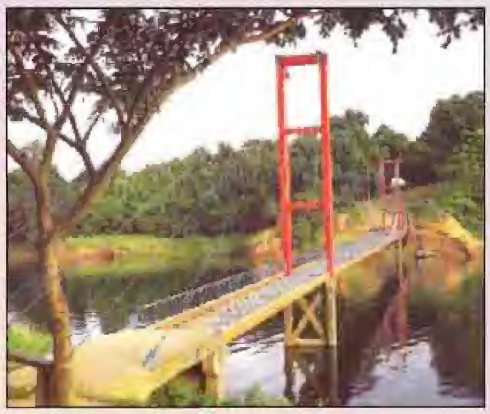

রাঙামাটির ঝুলন্ত ব্রিজ

আছে ঝুলন্ত ব্রিজ। এখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকদের হাতে বানানো বিভিন্ন ধরনের পোশাক ও হাতির দাঁতের গহনা পাওয়া যায়। এখানকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা, হ্রদের পানিতে মাছ ধরা ও স্পীড বোটে ঘুরে বেড়ানো, গোসল ও স্কি করা পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

বান্দরবানের বৌদ্ধমন্দির

বান্দরবান

বান্দরবান চট্টগ্রামের একটি পাহাড়ি জেলা। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত । বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম সুন্দরতম স্থান। বান্দরবান পাহাড়, বন ও সমভূমিতে ঘেরা প্রকৃতির এক অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়ি চূড়া অবস্থিত যার নাম তাজিনডং (বিজয়)। চিম্বুক পাহাড়ের চূড়া এবং বগা লেক বান্দরবান জেলার দুটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানে আছে সুউচ্চ পাহাড়ি চূড়া, পাহাড়ি জলাভূমি, লেক, পাহাড়ি ঝর্ণা। এখানে বৌদ্ধধর্মের একটি বড় মন্দির আছে যা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যেও সবচেয়ে সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির। এখানে বাংলাদেশে বুদ্ধের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূর্তি রয়েছে। এছাড়া সারা শহর জুড়ে আছে অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির। স্থানীয় ভাষায় এদেরকে বলা হয় কিয়াং। বান্দরবানের মিলানছড়িতে একটি পাহাড়ি ঝর্ণা আছে। এর নাম শৈলপ্রপাত। এটিও একটি সুন্দর জায়গা।

বান্দরবানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের সূর্যোদয়

কুয়াকাটা বাংলাদেশের আরেকটি অপূর্ব সুন্দর সমুদ্রসৈকত। বাংলাদেশের দক্ষিণে পটুয়াখালীতে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেষে এটি অবস্থিত। কুয়াকাটা শব্দের অর্থ হলো কুয়া খনন করা। ঢাকা থেকে ৩২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানকার প্রধান অধিবাসীদের নাম রাখাইন। বলা হয়ে থাকে কয়েকশ বছর আগে রাখাইনরা পানির জন্য এখানে কুয়া খনন করেছিল। সে থেকে এর নাম হয়েছে কুয়াকাটা। এখানে আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সমুদ্রসৈকত এবং রাখাইনদের আকর্ষণীয় পোশাক ও জীবনধারা। এটি বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্রসৈকত যেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। এখানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মন্দির আছে যেটি ১০০ বছরের পুরানো। এছাড়া কুয়াকাটার সমুদ্র তীরে ২০০ বছরের পুরানো দুটি কুয়া আছে। শীতে এখানে প্রচুর অতিথি পাখি আসে। কুয়াকাটা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থস্থান। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে কুয়াকাটাকে বলা হয় 'সাগর কন্যা'।

সেন্টমার্টিন

এটি বঙ্গোপসাগরের একটি ছোট দ্বীপ। টেকনাফ থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণে নাফ নদীর মুখে অবস্থিত। এর চারদিক ঘিরে আছে বঙ্গোপসাগর। স্থানীয় নাম নারিকেল জিঞ্জিরা। এর অর্থ নারিকেলের দ্বীপ। এখানে আছে প্রচুর নারিকেল ও তাল গাছের সমারোহ। এটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর পেশা মাছ ধরা ও শুঁটকি মাছ তৈরি করে বিক্রি করা। সেন্টমার্টিন একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। এখানকার

সেন্টমার্টিনের নারিকেল গাছের সারি

পানিতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী আছে। আরও আছে সুন্দরি গাছ, স্বচ্ছ পানির সমুদ্রতীর, চোরাবালি ইত্যাদি।

জাফলং

জাফলং সিলেট বিভাগে অবস্থিত। সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানায় হিমালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। খাসীয়া নৃগোষ্ঠীর অবাসস্থল। ফলে জাফলং গেলে খাসীয়াদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা দেখা যায় । পাথর সংগ্রহের জন্য জাফলং বিখ্যাত। এখানে ভারতের হিমালয় পর্বত থেকে মারী নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদীর পানিতে বয়ে আসে অনেক পাহাড়ি পাথর। পাহাড়ি পাথর স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ ও বিক্রি করে জীবিকা চালায়। জাফলং পুরোটাই পাহাড়ে ঘেরা এক অকৃত্রিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এই পাহাড় সবুজ বনে ঢাকা। এ সব বনে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আছে। জাফলং এর কাছে আরেকটি সুন্দর জায়গা আছে যার নাম তামাবিল। এটিও একটি চমৎকার জায়গা।

জাফলং এর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য

ওপরে উল্লিখিত স্থানগুলো ছাড়াও আমাদের দেশে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। এগুলো আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গৌরব। এগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। আর এগুলো সংরক্ষণের দায়িত্বও আমাদের।

আবার পড়ি

১. বাংলাদেশ প্রধানত সমভূমি। তবে দেশে কিছু পাহাড় ও উঁচু ভূমি আছে।
২. এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তবে দেশে তীব্র শীত বা গরম পড়ে না।
৩. দেশে অনেক প্রাকৃতিক সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর জায়গা আছে। এগুলো আমাদের ঐতিহ্য।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষক দেশের বিভিন্ন স্থানের একটি করে বৈশিষ্ট্য বলবেন। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সংশ্লিষ্ট স্থানের নাম বলবে। এভাবে শিক্ষার্থীদের নিয়ে দলগত প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।
২. বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে চার্ট তৈরি করা।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১.১ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কোথায় অবস্থিত ?

ক. রাঙামাটি খ. বান্দরবান
গ. কক্সবাজার ঘ. সেন্টমার্টিন

১.২ বাংলাদেশের উঁচু সমভূমি কী দিয়ে গঠিত ?

ক. পাহাড় খ. পুরাতন পলিমাটি
গ. চুনাপাথর ঘ. কাদামাটি

১.৩ সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কে ?

ক. ইউনেস্কো খ. ইউনিসেফ
গ. সার্ক ঘ. জাতিসংঘ

১.৪ বাংলাদেশের কোথায় শালবৃক্ষের বন আছে ?

ক. বান্দরবান খ. কুমিল্লা
গ. মধুপুর ঘ. রাঙামাটি

২. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. বাংলাদেশের বেশিরভাগ স্থান ———————— ভূমি ।

খ. বাংলাদেশের উঁচু সমভূমিকে বলা হয় ———————— ।

গ. এপ্রিল মে মাসে হওয়া ঝড়কে বলে ————————।

ঘ. সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ———————— ।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. সাগরকন্যা	সুন্দরবন
খ. বিশ্ব ঐতিহ্য	কক্সবাজার
গ. কাপ্তাই হ্রদ	সেন্টমার্টিন
ঘ. সুউঁচ্চ পাহাড়ি ঢেউ	কুয়াকাটা
	রাঙামাটি

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. বালাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের বর্ণনা দাও।

খ. গ্রীষ্ম ঋতুতে আমাদের দেশের জলবায়ু কেমন থাকে ?

গ. কুয়াকাটা, রাঙামাটি ও জাফলং–এ বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম লিখ।

ঘ. বান্দরবান জেলার দুটি উল্লেখযোগ্য স্থানের নাম লিখ।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. রাঙামাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে জানার মাধ্যমে দেশ সম্পর্কে তোমার মনে কী অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে পাঁচটি বাক্যে লিখ।

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য বা বি-৪

গাছ মানুষের পরম বন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত—বিক্রয়ের জন্য নয়।